গবেষণাপত্র সংকলন-১

ইল্‌মুত্‌ তাফসীর
ইল্‌মুল হাদীস
ইল্‌মুল ফিক্‌হ

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন-১

ইল্‌মুত্‌ তাফসীর
ইল্‌মুল হাদীস
ইল্‌মুল ফিক্‌হ

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০০৭ সন থেকে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর 'বিশেষ অধ্যয়ন অধিবেশন' (Special Study Session) অনুষ্ঠান শুরু করেছে।

প্রথম পর্বে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'অধ্যয়ন অধিবেশন' অনুষ্ঠিত হয়। তিনজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

'ইল্‌মুত তাফসীর' বিষয়ে মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউছুফ খান, 'ইল্‌মুল হাদীস' বিষয়ে মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান এবং 'ইল্‌মুল ফিক্‌হ' বিষয়ে ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

তিনটি অধিবেশনেই উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কয়েকজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ। সম্মানিত আলোচকবৃন্দ তাঁদের মন্তব্য ও মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রবন্ধগুলোর মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এই প্রবন্ধগুলোতে চিন্তাশীল পাঠকদের জন্য বিশেষ করে জেনারেল শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য, যথেষ্ট খোরাক রয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। সেই জন্য আমরা প্রবন্ধগুলোর সংকলন প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। এটি 'গবেষণাপত্র সংকলন-এক' নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে সংকলনটি সম্পাদনা করেন মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান।

আগামীতেও সিরিজ আকারে গবেষণাপত্র সংকলন প্রকাশিত হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের এই প্রয়াস কবুল করুন।

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

‘ইল্‌মুত্‌ তাফসীর

মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউছুফ খান

লেখক পরিচিতি

মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউছুফ খান ১৯৬৮ সালের ১২ মার্চ নেত্রকোনা জিলার সদর থানার অন্তর্গত মাহমুদপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশিষ্ট আলিমে দীন মরহুম মাওলানা মফিজ উদ্দিন। মাতা মরহুমা আবিদা আক্তার খানম। বর্তমানে তিনি ৪৫২ মিরহাজীর বাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকায় অবস্থান করছেন। তিনি ১৯৮৪ সালে ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া কুরআনীয়া আরাবিয়া লালবাগ থেকে দাওরায়ে হাদীস, ১৯৮৮ সালে কামিল হাদীস, ১৯৯০ সালে কামিল ফিকহ, ১৯৯৩ সালে কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৫ সালে আরবী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করে এম.এ পাস করেন। এছাড়া তিনি ইসলামী শরী'আহ ও এ্যারাবিক ক্যালিওগ্রাফীর উপর সার্টিফিকেট লাভ করেন এবং National Academy for Education Management (NAEM) থেকে শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে সনদ অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি গবেষক।

তিনি ১৯৮৯ সালে ঐতিহ্যবাহী তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার প্রভাষক (আরবী) হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে মুহাদ্দিস হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ২০০০ সাল থেকে অত্র দীনি প্রতিষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ খান শিক্ষা বিস্তারে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কমিটি ও প্রোগ্রামের সাথে সক্রিয় রয়েছেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর 'আল মুনজিদ অভিধান' সম্পাদনা কমিটির সদস্য। গ্রন্থকার শিক্ষা, গবেষণা এবং বিষয়ভিত্তিক পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অবদানের স্বাক্ষর রেখে চলছেন। বিশেষ করে "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড" এর মাধ্যমিক পর্যায়ের আরবী প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের আরবী প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র (যৌথ) বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের নবম ও দশম শ্রেণীর সিলেবাসভুক্ত কুরআন ও হাদীস এবং প্রথম শ্রেণী থেকে আলিম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী সাহিত্য (যৌথ) এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর আরবী ইন'শা গ্রন্থাবলীর সংকলক ও রচনাকারী।

এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা পত্রিকাসহ বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সাময়িকীতে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে তাঁর লিখিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৩টি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানবজীবনের জন্য কল্যাণকর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে রয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ সকল বিষয়ের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। অপূর্ব শব্দচয়ন, গুরুগম্ভীর ভাব এবং অনুপম গাঁথুনির কারণে এর সঠিক মর্মার্থ বুঝার জন্যে প্রয়োজন যথানিয়মে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এ প্রয়োজন পূরণের জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছে তাফসীর শাস্ত্র। তাফসীর শাস্ত্র একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও অর্থ বর্ণনা করার বিধানাবলী। কুরআন মাজীদ যেহেতু 'ওহী'র মাধ্যমে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সেহেতু পবিত্র আল-কুরআনের তাফসীর সংক্রান্ত আলোচনা করার আগে ওহী, আল-কুরআন নাযিলের ইতিহাস, শানে নুযূলসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি জেনে নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

ওহীর সংজ্ঞা

ওহী শব্দের আভিধানিক অর্থ গোপনে অবগত করানো, লেখা, প্রেরণ, ইলহাম-অবগতি, ইশারা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় ওহীর সংজ্ঞা সম্পর্কে বিদগ্ধ উলামা-ই-কিরাম শব্দের প্রায়োগিক পার্থক্যসহ অভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা ইব্‌ন হাজার আল আসকালানী (র) বলেন : ওহী হচ্ছে শরী'আত সম্পর্কে অবগত করানো। আল্লামা কুসতুলানী (র) বলেন : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী-রাসূলগণের নিকট যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছেন তা-ই ওহী। আল্লামা মাহমুদুল হাসান (র) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলগণকে যা গোপনে জানিয়ে দিয়েছেন তাই ওহী। আল জাওহারী (র) বলেন : ওহী হচ্ছে নবীদের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী। মোটকথা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলদের প্রতি যে প্রত্যাদেশ-ই করেছেন তা-ই ওহী।

ওহীর অপরিহার্যতা

আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানবজাতিকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন এবং তাদের উপর কতগুলো বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করে সমগ্র সৃষ্টি জগতকেই

মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। তদনুসারে জীবনে প্রত্যেক মানুষের উপরই দু'টি মৌলিক কর্তব্য বর্তায়। একটি হচ্ছে, সৃষ্টি জগতের যেসব বস্তু সে ব্যবহার করবে, সেগুলোর ব্যবহার যেন যথার্থ হয় এবং অপরটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত প্রতিটি বস্তু ব্যবহার করার সময় তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আদেশ-নিষেধের প্রতি যেন লক্ষ্য রাখা হয়। সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন কোন কাজ বা আচরণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হয়।

বর্ণিত দু'টি বিষয়ে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করার জন্যই 'ইলম বা জ্ঞানের প্রয়োজন। কেননা প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা বস্তুসমূহের কোন্‌টির মধ্যে কী গুণ নিহিত রয়েছে, আর কোন্‌ প্রক্রিয়ার দ্বারাই বা সেগুলো থেকে উপকার লাভ করা যায়, সে সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া বস্তুজগত দ্বারা পরিপূর্ণ উপকার লাভ করা সম্ভব নয়।

অপরপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথ কোন্‌টি, কোন্‌ কোন্‌ কাজ আল্লাহ তা'আলার পছন্দ এবং কোন্‌গুলো অপছন্দ, সে ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান না থাকলে তাঁর সন্তুষ্টি মুতাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভ করার মাধ্যম হিসেবে মানুষকে তিনটি বিষয় দান করেছেন। প্রথমটি তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয়টি আকল এবং তৃতীয়টি ওহী। মানুষ অনেক কিছুই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারে। আকলের মাধ্যমেও সে অনেক জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা কিংবা আকলের আওতার বাইরে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সেসব জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই ওহী প্রেরণ করেছেন। ওহীর মাধ্যমেই মানুষ তার বোধগম্য জগতে থেকেও বহু ঊর্ধ্বজগতের খবর প্রাপ্ত হয়েছে। কেননা পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যে সীমারেখা পর্যন্ত কাজ করে, আকলের সেখানে প্রয়োজন পড়ে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখান থেকেই আকলের কার্যকারিতা শুরু হয়। আকলের কার্যকারিতাও কিন্তু সীমাহীন নয়। একটা পর্যায়ে এসে আকলের কার্যকারিতাও শেষ হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, এমন অনেক তথ্য এবং মানব মনের এমন অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে, যেগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে আকল এবং অনুভূতির সম্মিলিত শক্তিও ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ধরনের বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার অতীত বিষয়াদি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দান করার জন্যই অল্লাহ তা'আলা ওহীর জ্ঞান দান করেছেন। এ জ্ঞান কিছু সংখ্যক মনোনীত বান্দার মাধ্যমে মানব জাতিকে

দান করা হয়েছে। ওহীর জ্ঞানপ্রাপ্ত সেসব মনোনীত বান্দাগণই 'নবী-রাসূল' নামে অভিহিত হয়েছেন।

মোটকথা, ওহী মানব জাতির প্রতি প্রদত্ত জ্ঞানের সেই উচ্চতর উৎস, যে উৎসের মাধ্যমে মানুষ তার জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কিংবা বুদ্ধির প্রখরতা সেখানে সম্পূর্ণ অপারগ। এতদসঙ্গে এ সত্যটুকুও স্বীকার করতে হয় যে, শুধুমাত্র বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা মানুষকে সঠিক পথনির্দেশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়, প্রকৃত পথনির্দেশ বা হিদায়াতের জন্য ওহীর ইল্‌ম অপরিহার্য। বুদ্ধির সীমা যেখানে শেষ, এর পর থেকেই যেহেতু ওহীর জ্ঞানের কার্যকারিতা শুরু হয় সেজন্য ওহীর বিষয়বস্তু শুধু আকলের মাপকাঠিতে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।[১]

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, এ মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু আছে, সে সবই একজন মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, তিনিই পরম নিপুণতার সাথে এ বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন, কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে এ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করতে হয় যে, দয়াময় সেই সৃষ্টিকর্তা এ অন্ধকার দুনিয়াতে কোন একটা ইঙ্গিত-ইশারা এবং আমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করার নিয়ম-কানুন না দিয়ে প্রেরণ করেননি। কেননা, আমরা এ দুনিয়ায় কেন প্রেরিত হয়েছি, এখানে আমাদের দায়িত্ব কী, আমাদের এ জীবনের উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যই বা কী, কিভাবেই বা আমরা জীবনের সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হবো, এ সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞান স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই আমাদেরকে দিয়েছেন, প্রতিটি প্রয়োজনের মুহূর্তে পরম যত্নে তা পরিবেশন করেছেন। যে কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ সম্পর্কে কী এরূপ ভাবা যায় যে, তিনি তাঁর কোন লোককে বিদেশে সফরে পাঠালেন, কিন্তু পাঠানোর সময় কিংবা তারপরেও লোক মারফত বা পত্র-যোগে তার কী কর্তব্য, কোন্ কোন্ কাজ সমাধা করে তাকে ফিরতে হবে, সফরে কিভাবে সে জীবন-যাপন করবে, সে সম্পর্কিত কোন নির্দেশই দিলেন না! যদি একজন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে এরূপ দায়িত্বহীন আচরণ আন্দাজ করা না যায়, তবে কি করে এরূপ ধারণা হতে পারে যে, যিনি এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং কল্পনাতীত নৈপুণ্যের সাথে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস সবকিছু একটা সুনির্ধারিত নিয়মের ভেতর পরিচালনা করছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের এ দুনিয়ায় কিছু গুরুদায়িত্ব দিয়ে

---

১. মা'আরিফুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২,

প্রেরণ করেছেন, কিন্তু তাদের জন্য কোন নির্দেশনামা, জীবনপথ চলার মত সঠিক হিদায়াত বা পথনির্দেশ প্রেরণ করার সুব্যবস্থা করেননি।

আল্লাহ তা'আলার মহাপ্রাজ্ঞ অস্তিত্ব সম্পর্কে যাদের ঈমান রয়েছে, তারা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার জন্য হিদায়াতবিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেননি– বান্দাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করেছেন। বলাবাহুল্য, সেই নির্দিষ্ট পন্থাটিই ওহীয়ে-ইলাহী নামে পরিচিত।

ওহী নাযিলের পদ্ধতি

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিভিন্নভাবে ওহী নাযিল হতো। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, একবার হযরত হারিস ইব্‌ন-হিশাম (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে রাসূল! আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে? রাসূল (সা) উত্তর দিলেন, কোন কোন সময় আমি ঘণ্টার আওয়াযের মত শুনি। ওহী নাযিলের এ অবস্থাটা আমার পক্ষে খুব কঠিন প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থায় ঘণ্টার মত আওয়াযের মাধ্যমে আমাকে যা কিছু বলা হয়, সে সবই আমার কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। আবার কখনও কখনও আমার সামনে ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে হাযির হয়ে কথা বলেন, আমি তা মুখস্থ করে নিই।[২]

এ হাদীসে ওহীর আওয়াযকে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক ঘণ্টার আওয়াযের সাথে তুলনা দেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে এক ধরনের নৈসর্গিক আওয়ায অনুভূত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কালাম প্রাপ্তিও ছিল ওহী নাযিল হওয়ার একটা পদ্ধতি। এ আওয়াযকে রাসূল (সা) ঘণ্টার অবিরাম আওয়াযের মতো বলে বর্ণনা করেছেন। বিরতিহীনভাবে ঘণ্টা যখন একটানা বাজতে থাকে, কখন আওয়ায কোন্ দিক থেকে আসছে, তা নির্ণয় করা সাধারণত শ্রোতার পক্ষে সম্ভব হয় না। মনে হয়, চারদিক থেকেই বুঝি আওয়ায ভেসে আসছে! ওহীর আওয়ায কেমন অনুভূত হতো একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই তা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করার উদ্দেশ্যেই সেই পবিত্র আওয়াযকে ঘণ্টাধ্বনির সাথে তুলনা করা হয়েছে।[৩]

---

২. বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২

৩. ফতুহুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯, ২০

আওয়ায সহকারে ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তা অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হতো। উক্ত হাদীসের শেষ ভাগে হযরত আয়িশা (রা) বলেন, শীতের দিনেও আমি রাসূল (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হতে দেখেছি। ওহী নাযিল হওয়া শেষ হলে প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও রাসূল (সা)-এর ললাটদেশ সম্পূর্ণরূপে ঘর্মাক্ত হয়ে যেতো। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রা) বলেন, ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্বাসনালী নালী ফুলে উঠতো, পবিত্র চেহারাও বিবর্ণ হয়ে শুকনা খেজুর শাখার মতো ধূসর মনে হতো। একদিকে ঠাণ্ডায় সামনের দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হতো এবং অপরদিকে শরীর এমন ঘর্মাক্ত হতো যেন মুক্তার মতো স্বেদবিন্দু ঝরতে থাকতো।[৪]

একবার রাসূল (সা) হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কোলে মাথা রেখে একটু আরাম করছিলেন। এ অবস্থায়ই ওহী নাযিল হতে শুরু করলো। হযরত যায়িদ (রা) বলেন, তখন তাঁর উরুদেশে এমন চাপ অনুভূত হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল তাঁর উরুর হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।[৫]

এ পদ্ধতিতে নাযিল হওয়া ওহীর হাল্‌কা মৃদু আওয়ায কোন কোন সময় অন্যদের কানে গিয়েও পৌঁছতো। হযরত উমার (রা) বর্ণনা করেন, কোন কোন সময় ওহী নাযিল হওয়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের চারদিকে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের ন্যায় গুন্‌ গুন্‌ শব্দ শোনা যেতো।[৬]

ওহী নাযিল হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল– ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের বেশে আগমন করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পয়গাম পৌঁছে দিতেন। এ অবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ)-কে সাধারণত প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহিয়া কালবী (রা)-র আকৃতিতে দেখা যেতো। কোন কোন সময় তিনি অন্য লোকের আকৃতি ধারণ করেও আসতেন। মানুষের বেশে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন এবং ওহী পৌঁছে দেওয়ার এ পদ্ধতিটাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা সহজ মনে হতো বলে তিনি ইরশাদ করেছেন।[৭]

তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিল– হযরত জিবরাঈল (আ) অন্য কোন রূপ ধারণ না করে

৪. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬
৫. যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮, ১৯
৬. মুসনাদে আহমদ, কিতাবুস সীরাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১২
৭. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৬

সরাসরি নিজের আসলরূপেই আবির্ভূত হতেন। জীবনে মাত্র তিনবার আল্লাহর রাসূল (সা) হযরত জিবরাঈলকে আসলরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। একবার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে আসল রূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাতে ও তৃতীয়বার নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মক্কা শরীফের 'আজইয়াদ' নামক স্থানে। প্রথম দু'বারের কথা সঠিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত।

তৃতীয়বারের দেখা সম্পর্কিত বর্ণনা সনদের দিক দিয়ে দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত।[৮]

চতুর্থ পদ্ধতি ছিল– সত্য স্বপ্ন। রাসূল (সা) নবুওয়াত লাভের প্রথম পর্যায়ে সত্য স্বপ্ন দেখতেন এবং জাগ্রত হওয়ার পর তাঁর প্রত্যেকটি স্বপ্নই নির্ভুল ও সত্য প্রমাণিত হতো।

পঞ্চম পদ্ধতি ছিল– কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে বাক্যালাপ। এ বিশেষ মর্যাদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় মাত্র একবার মি'রাজের রাত্রিতে লাভ করেছিলেন। অন্য একবার স্বপ্নযোগেও তিনি আল্লাহর সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন।[৯]

ওহীর ষষ্ঠ পদ্ধতি ছিল– হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা না দিয়ে রাসূল (সা)-এর পবিত্র অন্তরের মধ্যে কোন কথা ঢেলে দিতেন। পরিভাষায় এ পদ্ধতিকে "নাফছ ফির-রূহ" বলা হয়।[১০]

সপ্তম পদ্ধতি ছিল– কোন কোন সময় ইসরাফিল (আ) রাসূল (সা)-এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।

কুরআন মাজীদ

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার বাণী। তিনি মানব জাতির হিদায়াতের জন্য এটি মহানবী (সা)-এর উপর নাযিল করেছেন। এটি রাসূল (সা)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা।*

কুরআন মাজীদের সংজ্ঞা প্রদানে আল্লামা মোল্লা জিউন (র) বলেন : আল-কুরআন হলো সেই কিতাব যা রাসূল (সা)-এর ওপর অবতীর্ণ ও পুস্তক আকারে

---

৮. ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮, ১৯
৯. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬
১০. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩
* অলৌকিক ঘটনা মানুষ যা মুকাবিলা করতে অক্ষম।

লিপিবদ্ধ এবং রাসূল (সা) থেকে ধারাবাহিকভাবে নিঃসন্দেহে বর্ণিত। মোদ্দাকথা, বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা)-এর ওপর দীর্ঘ ২৩ বছরে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থই আল-কুরআন যা ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে পুস্তক আকারে সন্দেহাতীতভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

কুরআন মাজীদে বর্ণিত মূল প্রতিপাদ্য বিষয়াদি পাঁচ প্রকার :

এক. 'ইলমুল আহকাম বা সাংবিধানিক জ্ঞান। অর্থাৎ ইবাদাত-উপাসনা, লেনদেন, ঘর-সংসার, আচার-অনুষ্ঠান ও রাজনীতিসহ যে কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম বিষয়াদির জ্ঞানই হল সাংবিধানিক জ্ঞান। এ বিষয়ে আলোচনার দায়িত্ব ফকীহগণের যিম্মায় ন্যস্ত।

দুই. 'ইলমুল মুখাসামা তথা তর্ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান। অর্থাৎ ইয়াহুদী, নাছারা, মুশরিক ও মুনাফিক এ চার ভ্রষ্টদলের সাথে তর্ক শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করা। এ ধরনের ইলমের আলোচনার দায়িত্ব মুতাকাল্লিমীন তথা দার্শনিকগণের যিম্মায় ন্যস্ত।

তিন. ইলমুত তাযকীর বি আলাইল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন সংক্রান্ত জ্ঞান। আল্লাহর নিদর্শন সংক্রান্ত জ্ঞান হল আসমান-যমীন সৃষ্টির রহস্য, বান্দার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং আল্লাহর সিফাতে কামালিয়া বর্ণনা করা।

চার. ইলমুত তাযকীর বি আয়্যামিল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার সৃজিত বিশেষ ঘটনাসমূহের জ্ঞান। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় অনুগত বান্দাদের নেক আমলের পুরস্কার প্রদান এবং নাফরমান বান্দাদের পাপের শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা।

পাঁচ. 'ইলমুত তাযকীর বিল মাউত তথা পারলৌকিক জ্ঞান। অর্থাৎ মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থা, হাশর-নাশর, হিসাব, মীযান এবং জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কিত জ্ঞান। এ তিন প্রকার ইলমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহের বর্ণনা দান করা ওয়ায়েজ ও বক্তাদের দায়িত্ব।[১১]

আল-কুরআনের নামসমূহ

আবুল মা'আলী (র) স্বীয় গ্রন্থ "কিতাবুল বুরহান"-এ পবিত্র কুরআনের পঞ্চান্নটি নাম উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।[১২]

---

১১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র), আল-ফাউযুল কাবীর, পৃষ্ঠা-২০, ২১
১২. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১, ১০২

নং	আল-কুরআনের নামসমূহ	কত স্থানে এসেছে	সূরা নাম্বার
১	কিতাবুন (কিতাব)	২৩০	২-২০, ২২-৩৫, ৩৭-৪৬, ৫০, ৫২, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬২ ৬৮,৭৪, ৮৩, ৯৮
২	মুবীনুন (মুবীন)	১০৬	২, ৩, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৪- ১৬, ১৯, ২১-২৪, ২৬-২৯, ৩১, ৩৪, ৩৬ - ৪০, ৪৩-৪৬, ৫১, ৫২, ৬১, ৬৪, ৬৭, ৭১, ৮১
৩	কুরআনুন (কুরআন)	৫৮	৪-৭, ৯, ১০, ১২, ১৫-১৮, ২০, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৭, ৫০, ৫৪, ৫৬, ৫৯, ৭৩, ৭৬, ৮৪, ৮৫।
৪	কারীমুন (কারীম)	২৩	৮, ১২, ২২-২৪, ২৬, ২৭, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৪৪, ৫৬-৫৮, ৬৯, ৮১, ৮২
৫	কালামুন (কালাম)	৩	২, ৯, ৪৮
৬	নূরুন (নূর)	৯	৪, ৬, ১০, ২৪, ৪২, ৫৭, ৭১
৭	হুদান (হুদা)	৫৭	৬, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৬-২০, ২২, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫৩, ৬১, ৭২, ৯২, ৯৬
৮	রাহমাতুন (রাহমাত)	৭৯	২-৪, ৬, ৭, ৯, ১০-১২, ১৬-২০, ২১, ২৭-৩০, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৮-৪৬, ৫৭
৯	ফুরকানুন (ফুরকান)	৬	২, ৩, ৮, ২১, ২৫
১০	শিফাউ (শিফা)	৪	১০, ১৬, ১৭, ৪১
১১	মাওইযাতুন (মাওইযাত)	৯	২, ৩, ৫, ৭, ১০, ১১, ১৬, ২৪
১২	যিকরুন (যিক্র)	৫২	৩, ৫,৭, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯, ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৬২, ৬৩, ৬৮, ৭২, ৮১
১৩	মুবারাকুন (মুবারক)	৪	৬, ২১, ৩৮
১৪	আলিয়ুন (আলি)	৮	২, ২২, ৩১, ৩৪, ৪০, ৪২, ৪৩
১৫	হিকমাতুন (হিকমাত)	২০	২-৫, ১৬, ১৭, ৩১, ৩৩, ৩৮, ৪৩, ৫৪, ৬২

নং	আল-কুরআনের নামসমূহ	কত স্থানে এসেছে	সূরা নাম্বার
১৬	হাকীমুন (হাকীম)	৮১	২, ৪, ৫, ৬, ৮-১২, ১৪-১৬, ২২, ২৪, ২৭, ২৯-৩১, ৩৪-৩৬, ৩৯-৪৬, ৪৯, ৫১, ৫৭, ৫৯-৬২, ৬৪, ৬৬
১৭	মুহাইমিনুন (মুহাইমিন)	২	৫, ৫৯
১৮	হাবলুন (হাবুল)	৩	৩, ৫০
১৯	সিরাতুম মুস্তাকীম	৩১	১-৭, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৯, ২২, ২৪, ৩৬, ৩৭, ৪২, ৪৩, ৪৮, ৬৭
২০	কাইয়্যিমুন (কাইয়্যিম)	৫	৯, ১২, ১৮, ৩০
২১	কাওলুন (কাওল)	৫২	৩, ৪, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৯-২৪, ২৭, ২৮, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৯, ৪১, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫৮, ৬০, ৬৯, ৭৪, ৮১, ৮৬
২২	ফাসলুন (ফাস্‌ল)	৯	৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৪, ৭৭, ৭৮, ৮৬
২৩	নাবাউন আযীমুন	২	৩৮, ৭৮
২৪	আহসানুল হাদীস	১	৩৯
২৫	মুতাশাবীহুন (মুতাশাবিহ্‌)	৩	২, ৬, ৩৯
২৬	মাসানিউ (মাসানি)	২	১৫, ৩৯
২৭	তান্‌যীলুন (তানযীল)	১১	২৬, ৩২, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৫৬, ৬৯
২৮	রূহুন (রূহ্‌)	১৭	২, ৪, ৬, ১২, ১৬, ১৭, ২৬, ৪০, ৫৬, ৫৮, ৭০, ৮৭, ৯৭
২৯	ওয়াহইউন (ওয়াহ্‌উ)	২	২১, ৫৩
৩০	আরাবিয়্যুন (আরাবি)	১০	১২, ১৩, ১৬, ২০, ২৬, ৩৯, ৪১-৪৩, ৪৬
৩১	বাসায়িরু (বাসা-ইর)	৫	৬, ৭, ১৭, ২৮, ৪৫
৩২	বায়ানুন (বায়ান)	৩	৩, ৫৫, ৭৫
৩৩	ইল্‌মুন (ইল্‌ম)	৮০	২-৭, ১০-১৩, ১৬, ১৭, ১৯, ২২; ২৪, ২৭-৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৯-৪৮, ৫৩, ৫৮, ৬৮, ১০২
৩৪	হাক্কুন (হাক্ক)	২২৬	২-২৫, ২৭-৩৫, ৩৭-৪৮, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৯, ৭০, ৭৮, ১০৩

নং	আল-কুরআনের নামসমূহ	কত স্থানে এসেছে	সূরা নাম্বার
৩৫	হাদইউন (হাদীউ)	৭	২, ৫, ৭
৩৬	আযাবুন (আযাব)	৪	১০, ১৮, ৭২
৩৭	তাযকিরাতুন (তাযকিরাত)	৯	২০, ৫৬, ৬৯, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৮০
৩৮	উরওয়াতুল উস্কা	২	২, ৩১
৩৯	সিদকুন (সিদ্ক)	১০	১০, ১৭, ১৯, ২৬, ৩৯, ৪৬, ৫৪
৪০	আদলুন (আদল)	১৪	২, ৪, ৫, ৬, ১৬, ৪৯, ৬৫
৪১	আমারুন (আমর)	৭২	৩-১৯, ২২, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৩, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯-৫১, ৫৪, ৫৭, ৬৫, ৮২, ৯৭
৪২	মুনাদিউন (মুনাদি)	১	৩
৪৩	বুশরা	১৪	৩, ৮, ১০-১২, ১৬, ২৫, ২৭, ২৯, ৩৯, ৪৬, ৫৭
৪৪	মাজীদুন (মাজীদ)	৪	১১, ৫০, ৮৫
৪৫	যাবুরুন (যাবুর)	৩	৪, ১৭, ২১
৪৬	বাশীরুন (বাশীর)	৪	২, ৩৪, ৩৫, ৪১
৪৭	নাযীরুন (নাযীর)	১২	২, ১৭, ২৫, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৪৮, ৭৪
৪৮	আযীযুন (আযীয)	৯২	২, ৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৪, ১৬, ২২, ২৬, ২৭, ২৯-৩২, ৩৪-৩৬, ৩৮-৪৬, ৫৪, ৫৭-৬২, ৬৪, ৬৭, ৮৫
৪৯	বালাগুন (বালাগ)	১৩	৩, ৫, ১৩, ১৪, ১৬, ২৪, ২৯, ৩৬, ৪২, ৪৬, ৬৪
৫০	কাসাসুন (কাসাস)	৪	৩, ৭, ১২, ২৮
৫১	সুহুফুন (সুহুফ)	৮	২০, ৫৩, ৭৪, ৮০, ৮১, ৮৭, ৯৮
৫২	মারফুয়াতুন (মারফুয়াত)	৩	৫৪, ৮০, ৮৮
৫৩	মুত্বাহহারাতুন (মুত্বাহহারাত)	৫	২-৪, ৮০, ৯৮
৫৪	মুকাররামাতুন (মুকাররামাত)	১	৮০
৫৫	মুসাদ্দিকুন (মুসাদ্দিক)	৫	২, ৩, ৬, ৪৬

আল-কুরআন নাযিলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। সৃষ্টির সূচনা থেকেই তা লাওহে-মাহফুযে সুরক্ষিত রয়েছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : "বরং তা (সেই) আল-কুরআন (যা) লাওহে-মাহফুযে সুরক্ষিত রয়েছে।"[১৩] অতঃপর দু'টি পর্যায়ে আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। প্রথম পর্যায় সম্পূর্ণ আল-কুরআন একই সঙ্গে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে 'বাইতুল-ইযযতে' নাযিল করা হয়। 'বাইতুল ইযযত' যাকে বাইতুল-মা'মূরও বলা হয়, এটি কা'বা শরীফের বরাবরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে ফেরেশতাগণের ইবাদাত স্থান। এখানে আল-কুরআন এক সাথে লাইলাতুল কদরে নাযিল করা হয়েছিল।

অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত অল্প অল্প অংশ নাযিল হয়ে দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণ হয়। এ ছাড়া নাসায়ী, বাইহাকী, হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দিস হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা)-এর এমন কতগুলো রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদ এক সাথে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এবং পরে ধীরে ধীরে দীর্ঘ তেইশ বছরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে।[১৪]

আল-কুরআন এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাযিল করার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম আবু শামাহ (র) বলেন, এতদ্বারা আল-কুরআনের উচ্চতম মর্যাদা প্রকাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। তাছাড়া ফেরেশতাগণকেও এ তথ্য অবগত করানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এটিই আল্লাহর শেষ কিতাব, যা দুনিয়ায় মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে। শায়খ যুরকানী (র) অন্য আর-একটি তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এভাবে দুইবারে নাযিল করে একথাও বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এই কিতাব সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। তদুপরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বক্ষদেশ ছাড়াও আরো দু'জায়গায় এটি সুরক্ষিত রয়েছে, একটি "লাওহে মাহফুয" এবং অন্যটি "বাইতুল মা'মূর"।[১৫]

---

১৩. সূরা বুরূজ-২১, ২২
১৪. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮২
১৫. মানাহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১

পবিত্র কুরআন-এর নাযিল শুরু হয়েছিল লাইলাতুল কদরে। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণ কুরআন নাযিল হয়।

কুরআন মাজীদ নাযিল সংশ্লিষ্ট প্রকারসমূহ

নাযিল হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের প্রকারভেদ হলো বারটি। যথা–

১. মাক্কী।

২. মাদানী।

৩. হাযারী অর্থাৎ গৃহে অবস্থানকালে অবতীর্ণ হওয়া।

৪. সাফারী অর্থাৎ ভ্রমণ অবস্থায় নাযিল হওয়া।

৫. নাহারী অর্থাৎ দিবাকালে নাযিল হওয়া।

৬. লাইলী অর্থাৎ রাত্রিকালে নাযিল হওয়া।

৭. গ্রীষ্মকালে **নাযিল** হওয়া।

৮. শীতকালে নাযিল হওয়া।

৯. শয্যাবস্থায় নাযিল হওয়া।

১০. আসবাবে নুযূল অর্থাৎ কোন ঘটনার পূর্বে বা পরে নাযিল হওয়া।

১১. সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতসমূহ।

১২. সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত, সূরা।[১৬]

সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো **নাযিল** হয়, সেগুলো ছিল সূরা আল আলাক-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত। সহীহ বুখারীতে এ সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। এরপর থেকেই তাঁর মধ্যে নির্জনে ইবাদাত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি হেরা গুহায় রাতের পর রাত ইবাদাতে কাটাতে থাকেন। এ অবস্থাতেই এক রাতে হেরা গুহায় তাঁর নিকট আল্লাহর ফেরেশতা আসেন এবং তাঁকে বলেন, 'ইক্‌রা' (পড়ুন)। রাসূল (সা) উত্তর দেন, 'আমি পড়তে জানি না।'

---

১৬. আত্‌তানভীর ফী উছূলিত তাফসীর, পৃষ্ঠা-২৯-৩৪

পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন, আমার উত্তর শুনে ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরেন এবং এমনভাবে চাপ দেন যে, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

এরপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, 'পড়ুন'। আমি এবারও বলি, 'আমি পড়তে জানি না।' ফেরেশতা পুনরায় আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমি অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করতে থাকি। এরপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন।' এবারও আমি সেই একই উত্তর দেই, 'আমি পড়তে জানি না।' এ উত্তর শুনে ফেরেশতা আবারও আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভীষণভাবে চাপ দিলেন যে, আমি চরম ক্লান্তি অনুভব করতে থাকি। অতঃপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগলেন :

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.

"পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক টুকরা জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। পড়ুন এবং আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত অনুগ্রহপরায়ণ।" এ ছিল তাঁর প্রতি অবতীর্ণ প্রথম কয়েকটি আয়াত। এরপর ছয় মাস ওহী নাযিলের ধারা বন্ধ থাকে। এ সময়টুকুকে "ফাতরাতুল-ওহী"-র কাল বলা হয়। ছয় মাস পর হেরা গুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতাকেই তিনি আসমান ও যমিনের মধ্যস্থলে দেখতে পেলেন। ফেরেশতা তাঁকে সূরা আল মুদ্দাসসির-এর প্রথম সাতটি আয়াত শোনালেন। এরপর থেকেই নিয়মিত ওহী নাযিল হতে থাকে।

মাক্কী ও মাদানী সূরা

কুরআন মাজীদের সূরাগুলোর উপরে কোন কোনটিতে 'মাক্কী' এবং কোন কোনটিতে 'মাদানী' লেখা রয়েছে। এ ব্যাপারে নির্ভুল ধারণা লাভ করা জরুরী। মুফাসসিরগণের পরিভাষায় মাক্কী সূরা বা আয়াতের মর্ম হচ্ছে যেসব সূরা বা আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করার পূর্বে নাযিল হয়েছে। কোন কোন লোক মাক্কী আয়াত বলতে যেগুলো মক্কা শহরে এবং মাদানী বলতে যেগুলো মদীনায় নাযিল হয়েছে সেগুলোকে বুঝে থাকেন। এ ধারণা ঠিক নয়। এমনও অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মক্কা শহরে নাযিল হয়নি, কিন্তু যেহেতু হিজরাতের আগে নাযিল হয়েছে এজন্য এগুলোকে

মাক্কী বলা হয়। তেমনি যেসব আয়াত মিনা, আরাফাত কিংবা মি'রাজের সফরে নাযিল হয়েছে, এমনকি হিজরাতের সময় মদীনায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পথে পথে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলোকেও মাক্কী বলা হয়। তেমনি অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মদীনা শহরে নাযিল হয়নি, কিন্তু সেগুলো মাদানী। হিজরাতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক সফরে বের হতে হয়েছে। অনেক সময় মদীনা থেকে শত শত মাইল দূরেও গিয়েছেন, কিন্তু এসব স্থানে অবতীর্ণ আয়াতগুলোকেও মাদানীই বলা হয়। এমনকি যে সমস্ত আয়াত মক্কা বিজয়, হুদাইবিয়ার সন্ধি প্রভৃতি সময়ে মক্কা শহর কিংবা তার আশেপাশে নাযিল হয়েছে, সেগুলোকেও মাদানী বলা হয়। কুরআন মাজীদের আয়াত :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.

মক্কা শহরেই নাযিল হয়েছে, কিন্তু হিজরাতের পরে নাযিল হওয়ার কারণে এই আয়াতও মাদানী।[১৭] কোন কোন সূরার পুরোটাই মাক্কী, যেমন, সূরা আল মুদ্দাস্‌সির। অপরদিকে কোন কোন সূরা পুরোটাই মাদানী, যেমন সূরা আলে-ইমরান।

কিন্তু এমনও রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা মাক্কী, কিন্তু তার মধ্যে দু'একটি মাদানী আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ মাদানী সূরার মধ্যে দু'একটি মাক্কী আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, সূরা আল আ'রাফ মাক্কী কিন্তু এ সূরাতে মাদানী আয়াতও রয়েছে।

মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য

'ইল্‌মুত্‌ তাফসীরের বিশেষজ্ঞগণ মাক্কী ও মাদানী সূরাগুলো বাছাই করে এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন, যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায়, সূরাটি মাক্কী না মাদানী। তাঁদের নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কয়েকটি এমন যে, যেগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির পর্যায়ে ফেলা যায়। কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আবার এরূপ যে, এগুলো দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে, এ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সূরাগুলো মাক্কী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি না মাদানী হওয়ার।

---

১৭. আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৮, মানাহিলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৮

মূলনীতিসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল :

মাক্কী আয়াত বা সূরার বৈশিষ্ট্য	মাদানী আয়াত বা সূরার বৈশিষ্ট্য
১. ইসলামী দাওয়াত ও প্রচার কার্যের ওপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে এবং সম্বোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিনম্রতা ও কোমলনীতি অবলম্বন করা হয়েছে।	১. চিন্তার গভীরতা, ব্যাপকতা ও তীক্ষ্ণতা বিরাজমান।
২. কাফিরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা উল্লেখ নেই।	২. ইসলামের প্রচার কার্যের সঙ্গে সঙ্গে কাফিরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার নির্দেশও রয়েছে।
৩. কঠিন কঠিন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।	৩. আদেশ, আইন ও কাজের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।
৪. হৃদয়াবেগ ও মনস্তত্ত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।	৪. ইবাদাত এবং আল্লাহর হুকুম পালনের নির্দেশ রয়েছে।
মাক্কী আয়াত বা সূরার বৈশিষ্ট্য	মাদানী আয়াত বা সূরার বৈশিষ্ট্য
৫. তাওহীদ, আখিরাত এবং অন্যান্য উপদেশ নসীহতের বিষয় উল্লেখ রয়েছে।	৫. মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে।
৬. আদম (আ) এবং ইবলিসের কাহিনী বিবৃত হয়েছে।	৬. শব্দাবলীতে প্রায়ই নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে।
৭. ইবাদাত ও কাজের বাস্তব নির্দেশ কম।	৭. আহলে কিতাব, সন্ধি, যিম্মি ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে।
৮. আকীদা ও মতাদর্শ সম্পর্কীয় আলোচনা করা হয়েছে।	৮ সমাজ গঠনের বিধান সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে।
৯. ইহুদি ও নাসারাদের সাথে কোনো বিতর্কের উল্লেখ নেই।	৯. আহলে কিতাবদের সাথে রীতিমত বিতর্কের উল্লেখ রয়েছে।
১০. ভাষা স্বচ্ছ, রচনাশৈলী নিরূপম যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হওয়ার যোগ্য এবং অতি উন্নত সাহিত্যরসে ভরপুর।	১০. হদ তথা দণ্ডবিধির কথা উল্লেখ রয়েছে।
১১. শরী'আতের বিধান নিয়ে কোনো আলোচনা নেই।	১১. বিবাহ, তালাক, যাকাত, হজ্জ, ফারায়েয ইত্যাদি শরয়ী বিধানাবলীর বর্ণনা রয়েছে।
১২. আয়াতসমূহ ছোট ছোট এবং কোথাও কোথাও كلا (কখনই নয়) ব্যবহৃত হয়েছে।	১২. মাদানী আয়াতসমূহ সাধারণত দীর্ঘ।
১৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে يايها الناس (হে মানুষ!) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।	১৩. প্রায়শই يايها الذين امنوا (হে মুমিনগণ!) বলে জনতাকে সম্বোধন করা হয়েছে।
১৪. কয়েকটি সূরায় সাজদার আয়াত রয়েছে।	১৪. জনতাকে يايها الناس বলে খুব কমই সম্বোধন করা হয়েছে। মাত্র সাতটি আয়াতে এ জাতীয় সম্বোধন পরিলক্ষিত হয়।
১৫. কয়েকটি সূরায় হুরূফে মুকাত্তা'আত রয়েছে।	১৫. জয়-পরাজয়, বিপদাপদ, নিরাপত্তা, বিপন্নতা ইত্যাদি অবস্থায় মুসলিমদের কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

এক নজরে মাক্কী-মাদানী সূরাসমূহ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের সূরা সংখ্যা কত এ নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যথা

১। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে আল কুরআনের সর্বমোট সূরার সংখ্যা ১১৪টি। যা মাছহাফে উসমানীতে বিদ্যমান আছ।[১৮]

২। কেউ কেউ বলেন, আল কুরআনের সর্বমোট সূরার সংখ্যা ১১৩টি। তাঁরা সূরা আল আনফাল ও আত্ তাওবাকে এক সূরা হিসেবে গণ্য করেন।

৩। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর মতে, আল কুরআনের সর্বমোট সূরার সংখ্যা ১১২টি। তিনি সূরা আন নাস ও আল ফালাককে সূরা মনে করেননি (এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়)।

৪। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) এর মতে, আল-কুরআনের সর্বমোট সূরা হচ্ছে ১১৬টি (এ মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়)।[১৯]

প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে আল-কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১৪টি।

কাতাদাহ (রা) এর মতে মাক্কী সূরা ৮৮টি, মাদানী সূরা ২৬টি।

* কারো মতে মাক্কী সূরা ৯২টি এবং মাদানী সূরা ২২টি।

* আবার কেউ কেউ বলেন মাক্কী সূরা ৮৬টি, মাদানী সূরা ২৮টি।

নিম্নে অগ্রাধিকারযোগ্য একটি বর্ণনানুযায়ী মক্কায় ও মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের তালিকা পেশ করা হল :[২০]

*** হযরত কাতাদাহ (রা)-এর মতে মাক্কী সূরা ৮৮টি।**

মাক্কী ক্রমধারা	ক্রমধারা	অবতীর্ণ ধারা	সূরার নাম	সূরার অর্থ	পারা নং	রুকূ সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
০১	০১	০৫	আল্ ফাতিহা	ভূমিকা, উপক্রমণিকা	০১	০১	০৭
০২	০৬	৫৫	আল্ আন'আম	চতুষ্পদ পশুগুলো	০৮	২০	১৬৫
০৩	০৭	৩৯	আল্ আ'রাফ	সমুন্নত স্থান	০৮	২৪	২০৬
০৪	০৮	৮৮	আল্ আনফাল	অতিরিক্ত, সংযোজন	০৯	১০	৭৫
০৫	১০	৫১	ইউনুস	হযরত ইউনুস (আ)	১১	১১	১০৯

---

১৮. আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩০
১৯. আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩০
২০. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৫

মাক্কী ক্রমধারা	ক্রমধারা	অবতীর্ণ ধারা	সূরার নাম	সূরার অর্থ	পারা নং	রুকূ সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
০৬	১১	৫২	হূদ	হযরত হূদ	১১	১০	১২৩
০৭	১২	৫৩	ইউসুফ	হযরত ইউসুফ (আ)	১২	১২	১১১
০৮	১৪	৭২	ইবরাহীম	হযরত ইবরাহীম (আ)	১৩	০৭	৫২
০৯	১৫	৫৪	আল হিজর	হিজর শহরের নাম	১৩	০৬	৯৯
১০	১৭	৫০	বনি ইসরাঈল/ইসরা	ইসরাঈল বংশ	১৫	১২	১১১
১১	১৮	৬৯	আল কাহফ	গুহা, পর্বত গুহা	১৫	১২	১১০
১২	১৯	৪৪	মারইয়াম	হযরত মারইয়াম (আ)	১৬	০৬	৯৮
১৩	২০	৪৫	তাহা	তাহা সূরার নাম	১৬	০৮	১৩৫
১৪	২১	৭৩	আল আম্বিয়া	নবীগণ	১৭	০৭	১১২
১৫	২৩	৭৪	আল মুমিনুন	বিশ্বাসীগণ	১৮	০৬	১১৮
১৬	২৫	৪২	আল ফুরকান	পৃথককরণ	১৮	০৬	৭৭
১৭	২৬	৪৭	আশ শু'আরা	কবিগণ	১৯	১১	২২৭
১৮	২৭	৪৮	আন্ নামল	পিপীলিকা	১৯	০৭	৯৩
১৯	২৮	৪৯	আল কাসাস	ইতিহাস, কাহিনী	২০	০৯	৮৮
২০	২৯	৮৫	আল আনকাবূত	মাকড়সা	২০	০৭	৬৯
২১	৩০	৮৪	আররূম	রোম সাম্রাজ্য, রোমান শক্তি	২১	০৬	৬০
২২	৩১	৫৭	লুকমান	হযরত লুকমান	২১	০৪	৩৪
২৩	৩২	৭৫	আসসাজদাহ	সাজদা	২১	০৩	৩০
২৪	৩৪	৫৮	সাবা	সাবাজাতি বিশেষ	২২	০৬	৫৪
২৫	৩৫	৪৩	ফাতির	সৃষ্টিকর্তা	২২	০৫	৪৫
২৬	৩৬	৪১	ইয়াসিন	ইয়াসিন সূরার নাম	২২	০৫	৮৩
২৭	৩৭	৫৬	আছ্ ছাফ্ফাত	কাতার, শ্রেণীবদ্ধ	২৩	০৫	১৮২
২৮	৩৮	৩৮	ছোয়াদ	ছোয়াদ সূরার নাম	২৩	০৫	৮৮
২৯	৩৯	৫৯	আয্‌যুমার	সম্প্রদায়	২৩	০৮	৭৫
৩০	৪০	৬০	আল মুমিন	বিশ্বাসী	২৪	০৯	৮৫
৩১	৪১	৬১	হামীম আসসাজদাহ	হামীম সূরার নাম	২৪	০৬	৫৪
৩২	৪২	৬২	আশ শূরা	আলোচনা, পরামর্শ	২৫	০৫	৫৩
৩৩	৪৩	৬৩	আয যুখরুফ	স্বর্ণ, প্রসাধন	২৫	০৭	৮৯
৩৪	৪৪	৬৪	আদ দুখান	ধোঁয়া, বাষ্প	২৫	০৩	৫৯

মাক্কী ক্রমধারা	ক্রমধারা	অবতীর্ণ ধারা	সূরার নাম	সূরার অর্থ	পারা নং	রুকূ সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
৩৫	৪৫	৬৫	আল জাসিয়া	অবনমিত, নতজানু	২৫	০৪	৩৭
৩৬	৪৬	৬৬	আল আহকাফ	বালুকা স্তূপ	২৬	০৪	৩৫
৩৭	৫০	৩৪	কাফ	কাফ সূরার নাম	২৬	০৩	৪৫
৩৮	৫১	৬৭	আজ জারিয়াত	ধূলিবালি মিশ্রিত বাতাস	২৬	০৩	৬০
৩৯	৫২	৭৬	আত তূর	তূর পর্বতের নাম	২৭	০২	৪৯
৪০	৫৩	২৩	আন নাজম	নক্ষত্র পুঞ্জ	২৭	০৩	৬২
৪১	৫৪	৩৭	আল কামার	চন্দ্র	২৭	০৩	৫৫
৪২	৫৬	৪৬	আল ওয়াকিয়া	মহাঘটনা, কিয়ামাত	২৭	০৩	৯৬
৪৩	৬৭	৭৭	আল মুল্‌ক	রাজত্ব, আধিপত্য	২৯	০২	৩০
৪৪	৬৮	০২	আল কলম	লিখনী, কলম	২৯	০২	৫২
৪৫	৬৯	৭৮	আল হাক্কাহ	সুনিশ্চিত	২৯	০২	৪৪
৪৬	৭০	৭৯	আল মা'আরিজ	সিঁড়িগুলো	২৯	০২	৪৪
৪৭	৭১	৭১	নূহ	হযরত নূহ (আ)	২৯	০২	২৮
৪৮	৭২	৪০	জ্বিন	জীন জাতি	২৯	০২	২৮
৪৯	৭৩	০৩	আল মুয্‌যাম্মিল	কম্বলাবৃত	২৯	০২	২০
৫০	৭৪	০৪	আল মুদ্দাসসির	বসনাবৃত	২৯	০২	৫৬
৫১	৭৫	৩১	আল কিয়ামাহ	উত্থান, কিয়ামাত	২৯	০২	৪০
৫২	৭৬	৯৮	আদ দাহর/ইনসান	কাল, সময়/মানুষ	২৯	০২	৩১
৫৩	৭৭	৩৩	আল মুরসালাত	প্রবাহিত হয়, বাতাস	২৯	০২	৫০
৫৪	৭৮	৮০	আন নাবা	সংবাদ	৩০	০২	৪০
৫৫	৭৯	৮১	আন নাযিয়াত	নিষ্পন্ন	৩০	০২	৪৬
৫৬	৮০	২৪	আবাসা	মুখ ফিরিয়ে নেয়া	৩০	০১	৪২
৫৭	৮১	০৭	আত তাকভীর	গুটান, সংকোচন	৩০	০১	২৯
৫৮	৮২	৮২	আল ইনফিতার	বিদীর্ণ হওয়া	৩০	০১	১৯
৫৯	৮৩	৮৬	আল মুতাফফিফীন	ওজনে যারা কম দেয়	৩০	০১	৩৬
৬০	৮৪	৮৩	আল ইনশিকাক	ফেটে যাওয়া	৩০	০১	২৫
৬১	৮৫	২৭	আল বুরুজ	কক্ষপথ, দুর্গ	৩০	০১	২২
৬২	৮৬	৩৬	আত তারিক	রাত্রিতে আগমনকারী	৩০	০১	১৭
৬৩	৮৭	০৮	আল আ'লা	উচ্চতম মহান	৩০	০১	১৯

মাক্কী ক্রমধারা	ক্রমধারা	অবতীর্ণ ধারা	সূরার নাম	সূরার অর্থ	পারা নং	রুকূ সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
৬৪	৮৮	৬৮	আল গাশিয়াহ্	আচ্ছন্নকারী	৩০	০১	২৬
৬৫	৮৯	১০	আল ফাজর	প্রাতঃকাল	৩০	০১	৩০
৬৬	৯০	৩৫	আল বালাদ	শহর, নগর	৩০	০১	২০
৬৭	৯১	২৬	আশ শামছ	সূর্য	৩০	০১	১৫
৬৮	৯২	০৯	আল লাইল	রাত্রি, রজনী	৩০	০১	২১
৬৯	৯৩	১১	আদ দোহা	উজ্জ্বল দিন	৩০	০১	১১
৭০	৯৪	১২	আল ইনশিরাহ্	উন্মুক্তকরণ	৩০	০১	০৮
৭১	৯৫	২৮	আত্ত্বীন	ডুমুর ফল	৩০	০১	০৮
৭২	৯৬	০১	আল 'আলাক	জমাট রক্তপিণ্ড	৩০	০১	১৯
৭৩	৯৭	২৫	আলকদর	ভাগ্য	৩০	০১	০৫
৭৪	৯৮	১০০	আল বাইয়্যিনাহ	প্রকাশ্য প্রমাণ	৩০	০১	০৮
৭৫	১০০	১৪	আল আদিআত	দ্রুতগতি	৩০	০১	১১
৭৬	১০১	৩০	আল কারিয়াহ্	আঘাতকারী	৩০	০১	১১
৭৭	১০২	১৬	আত তাকাসুর	আধিক্যের আকাঙ্ক্ষা	৩০	০১	০৮
৭৮	১০৩	১৩	আল আসর	সময়, যুগযুগান্তর	৩০	০১	০৩
৭৯	১০৪	৩২	আল হুমাযাহ্	অপবাদকারী	৩০	০১	০৯
৮০	১০৫	১৯	আল্ ফীল	হস্তি, গজ	৩০	০১	০৫
৮১	১০৬	২৯	কুরাইশ	কুরাইশ বংশ	৩০	০১	০৪
৮২	১০৭	১৭	আল মাউন	নিত্য প্রয়োজনীয়দ্রব্য	৩০	০১	০৭
৮৩	১০৮	১৫	আল কাউসার	আধিক্য, জান্নাতের একটি সরোবর	৩০	০১	০৩
৮৪	১০৯	১৮	আল্ কাফিরুন	অবিশ্বাসীরা	৩০	০১	০৬
৮৫	১১১	০৬	আল লাহাব	অগ্নিশিখা	৩০	০১	০৫
৮৬	১১২	২২	আল ইখ্লাস	বিশোধিত, সারনির্যাস	৩০	০১	০৪
৮৭	১১৩	২০	আল ফালাক	বিদীর্ণ হওয়া	৩০	০১	০৫
৮৮	১১৪	২১	আন্ নাস্	মানুষ, মানবজাতি	৩০	০১	০৬

হযরত কাতাদা (রা)-এর মতে মাদানী সূরা ২৬টি। তালিকা নিম্নরূপ :

মাদানী ক্রমধারা	ক্রমধারা	অবতীর্ণ ধারা	সূরার নাম	সূরার বাংলা অর্থ	পারা নং	রুকূ সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
০১	০২	৮৭	আল বাকারা	গাভী	০১	৪০	২৮৬
০২	০৩	৮৯	আলে ইমরান	ইমরান পরিবার	০৩	২০	২০০
০৩	০৪	৯২	আন্ নিসা	নারীগণ, স্ত্রীগণ	০৪	২৪	১৭৬
০৪	০৫	১১২	আল মায়িদা	দস্তরখান	০৬	১৬	১২০
০৫	০৯	১১৩	আল-বারাআত (আত্-তাওবা)	ক্ষমা প্রার্থনা	১০	১৬	১২৯
০৬	১৩	৯৬	আর্ রা'দ	বজ্রধ্বনি	৪৩	১৩	৬০
০৭	১৬	৭০	আন্ নাহল	মধুমক্ষিকা, মৌমাছি	১৬	১২৮	১৪
০৮	২২	১০৩	আল্ হজ্জ	সংকল্প করা	৭০	৭৮	১৭
০৯	২৪	১০২	আন্ নূর	জ্যোতি, আলো	০৯	৬৪	১৮
১০	৩৩	৯০	আল্ আহ্যাব	সম্প্রদায়, সম্মিলিত বাহিনী	০৯	৭৩	২১
১১	৪৭	৯৫	মুহাম্মাদ	বারবার প্রশংসিত	০৪	৩৮	২৬
১২	৪৮	১১১	আল্ ফাতহ্	বিজয়	০৪	৩৮	২৬
১৩	৪৯	১০৬	আল্ হুজুরাত	কক্ষ/হুজরা খানা	০২	১৮	২৬
১৪	৫৫	৯৭	আর্ রাহ্মান	দয়ালু/প্রেমময়	০৩	৭৮	২৭
১৫	৫৮	১০৫	আল মুজাদালাহ্	তর্কবিতর্ক করা	০৩	২২	২৮
১৬	৫৭	৯৪	আল হাদীদ	লৌহ, লৌহ অস্ত্র	০৪	২৯	২৭
১৭	৫৯	১০১	আল্ হাশর	সমবেত করা, একত্রিত করা	০৩	২৪	২৮
১৮	৬০	৯১	আল্ মুমতাহিনা	পরীক্ষিত	০২	১৩	২৮
১৯	৬১	১০৯	আছ্ ছফ	শ্রেণীবদ্ধ, সারিবদ্ধ	০২	১৪	২৮
২০	৬২	১১০	আল্ জুমু'আ	সম্মিলিত হওয়া	০২	১১	২৮
২১	৬৩	১০৪	আল মুনাফিকুন	কপট বিশ্বাসী	০২	১১	২৮

২২	৬৪	১০৮	আত্‌ তাগাবুন	জয়পরাজয়	০২	১৮	২৮
২৩	৬৫	৯৯	আত্‌ ত্বালাক্ব	স্ত্রীত্যাগ	০২	১২	২৮
২৪	৬৬	১০৭	আত্‌ তাহরীম	অবৈধকরণ	০২	১২	২৮
২৫	৯৯	৯৩	আয্‌ যিলযাল	ভূমিকম্প, কাঁপা	০১	০৮	৩০
২৬	১১০	১১৪	আন নাছর	সাহায্য ও বিজয়	০১	০৩	৩০

মতভেদপূর্ণ সূরাসমূহ

উল্লেখ্য যে, কয়েকটি সূরা নিয়ে মুফাসসিরীনদের মাঝে মতভেদ রয়েছে যে, এগুলো মাক্কী না মাদানী। এগুলো নিম্নে পেশ করা হল। যেমন :

০১	সূরা আল ফাতিহা	১৭	সূরা আল আ'লা
০২	সূরাতুন নিসা	১৮	সূরা আল ফাজর
০৩	সূরা ইউনুস	১৯	সূরা আলা বালাদ
০৪	সূরাতুর রাদ	২০	সূরা আল লাইল
০৫	সূরা-আল হাজ্জ	২১	সূরা আল কদর
০৬	সূরা ছোয়াদ	২২	সূরা আল বাইয়্যিনাহ
০৭	সূরা ইয়াসিন	২৩	সূরা আযযিলযাল
০৮	সূরা আল হুজুরাত	২৪	সূরা আল আদিয়াত
০৯	সুরা আররাহমান	২৫	সূরা আত-তাকাসুর
১০	সূরা আল হাদীদ	২৬	সূরা আল মাউন
১১	সূরা আছ্‌ ছফ	২৭	সূরা আল কাউসার
১২	সূরা আল জুমু'আ	২৮	সূরা আল ইখলাস
১৩	সূরা আত-তাগাবুন	২৯	সূরা মুহাম্মাদ
১৪	সূরা আল মুলক	৩০	সূরা আল ফুরকান
১৫	সূরা আল ইনসান	৩১	সূরা আন্‌নাস
১৬	সূরা আল মুতাফফিফীন	৩২	সূরা আল ফালাক

আল-কুরআন অংশ অংশ করে নাযিল হওয়ার কারণ

আগেই বলা হয়েছে যে, আল-কুরআন একবারে একই সঙ্গে নাযিল না হয়ে ধীরে ধীরে তেইশ বছরে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ

হয়েছে। কোন কোন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) খুব ছোট একখানা আয়াত, এমনকি কোন আয়াতের ছোট একটা অংশ নিয়েও এসেছেন। কোন কোন সময় আবার কয়েকটি আয়াতও এক সাথে নাযিল করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সর্বাপেক্ষা ছোট যে আয়াতাংশ নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন হয়েছে, তা ছিল সূরা আন্ নিসার একটি দীর্ঘ আয়াতের ছোট এক অংশ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ অথচ অপরদিকে সমগ্র সূরা আল আন'আম একই সঙ্গে নাযিল হয়েছে। কুরআন শরীফকে একবারে নাযিল না করে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে কেন নাযিল করা হলো, এ প্রশ্ন আরবের মুশরিকরাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উত্থাপন করেছিল। এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রদান করেছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لاَنُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً وَلاَيَاْتُوْنَكَ بِمثل اِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنُ تَفْسِيْرًا.

অর্থাৎ "এবং কাফিররা বলে, আল-কুরআন তাঁর প্রতি একবারে কেন নাযিল করা হলো না? এইভাবে (অল্প অল্প করে আমি পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি) যেন আপনার অন্তরে তা দৃঢ়মূল করে দেওয়া যায় এবং আমি ধীরে ধীরে তা পাঠ করেছি। তা ছাড়া এরা এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না, যার (মুকাবিলায়) আমি যথার্থ সত্য এবং তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করব না।"

উক্ত আয়াতের তাফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম রাযী (র) কুরআন শরীফ পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, তা এখানে তুলে ধরা হল। তিনি বলেছেন ঃ

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মী ছিলেন, লেখাপড়ার চর্চা করতেন না। এমতাবস্থায় কুরআন যদি একই সাথে একবারে নাযিল হতো, তবে তা স্মরণ রাখা বা অন্য কোন পন্থায় সংরক্ষণ করা হয়ত তাঁর পক্ষে কঠিন হতো। অপর পক্ষে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যেহেতু লেখাপড়া জানতেন, সেজন্য তাঁর প্রতি তাওরাত একই সঙ্গে নাযিল করা হয়েছিল। কারণ তিনি লিপিবদ্ধ আকারে তাওরাত সংরক্ষণে সমর্থ ছিলেন।

২. সমগ্র আল-কুরআন যদি একই সঙ্গে নাযিল হতো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের প্রতিটি হুকুম-আহকামের প্রতি আমল করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াতো। এতদ্বারা শরী'আত মুহাম্মাদীতে ধীরে ধীরে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে

প্রতিটি নির্দেশ পালনে আনুসারীদেরকে অভ্যস্ত করে নেওয়া এবং হাতে-কলমে সেসব নির্দেশের উপর আমল করার যে পন্থা অবলম্বিত হয়েছে, তা ব্যাহত হতো।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিনই তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যে নতুন নতুন নির্যাতনের সম্মুখীন হতেন, এ অবস্থায় আল-কুরআনের আয়াতসহ জিবরাঈল (আ)-এর বার বার আগমন তাঁর মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে সহায়ক হতো।

৪. আল-কুরআনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় সেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার পর এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে সে সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এতে একাধারে যেমন মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে, তেমনি সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে অগ্রিম সংবাদ প্রদানের ফলে আল-কুরআনের সত্যতার দাবী অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে।[২১]

শানে নুযূল (পটভূমি)

আল-কুরআনের আয়াতসমূহ দু'ধরনের। এক ধরনের আয়াত হচ্ছে যেগুলো আল্লাহ তা'আলা নিজের তরফ থেকে কোন নির্দেশ, উপদেশমূলক প্রসঙ্গ বর্ণনা উপলক্ষে নাযিল করেছেন। কোন বিশেষ ঘটনা কিংবা কারো কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সেগুলো নাযিল হয়নি। অন্য এক ধরনের আয়াত রয়েছে, যেগুলো বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষে কিংবা কোন প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনা কিংবা প্রশ্নগুলোকে সেসব আয়াতের পটভূমি হিসাবে গণ্য করা যায়। সে পটভূমিকেই তাফসীরের পরিভাষায় 'শানে-নুযূল' বা 'সববে-নুযূল' বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ সূরা আল বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমীন বলেন,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ.

"মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যে পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। একজন মুমিন দাসীও একজন মুশরিক নারী থেকে উত্তম, তোমাদের চোখে সে নারী যত

---

২১. তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৬

আকর্ষণীয়ই মনে হোক না কেন।" এ আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার পটভূমিতে নাযিল হয়েছিল। ঘটনাটি হচ্ছে, হযরত মারসাদ ইব্‌ন আবী মারসাদ নামক এক সাহাবীর জাহিলিয়াত যুগে 'ইনাক' নাম্নী এক মহিলার সঙ্গে গভীর প্রণয় ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত মারসাদ (রা) হিজরাত করে মদীনায় চলে যান, কিন্তু ইনাক মক্কাতেই থেকে যায়। একবার কোন কাজ উপলক্ষে হযরত মারসাদ (রা) মক্কায় আগমন করলে ইনাক তাঁকে পূর্বের আসক্তির ভিত্তিতে তাঁর সাথে রাত যাপনের আমন্ত্রণ জানায়। হযরত মারসাদ (রা) সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'ইসলাম তোমার সাথে আমার অবাধ মিলনের পথে প্রাচীর সৃষ্টি করে দিয়েছে। এখন যদি তুমি একান্তই আমার সাথে মিলিত হতে আকাঙ্ক্ষী হও, তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতি নিয়ে তোমাকে বিবাহ করতে পারি। মদীনায় ফিরে এসে হযরত মারসাদ (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উক্ত মহিলাকে বিবাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে মুমিনদের পক্ষে মুশরিক নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।[২২]

উক্ত ঘটনাটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আয়াতের শানে-নুযূল বা সববে-নুযূল। তাফসীর প্রদানের ক্ষেত্রে শানে-নুযূল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলো নাযিল হওয়ার পটভূমি বা শানে-নুযূল জানা না থাকলে সেগুলোর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ধার করা অসম্ভব।

সাত হরফ বা সাত কিরাআত

সর্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষে তিলাওয়াত সহজতর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের কিছু সংখ্যক শব্দ বিভিন্ন উচ্চারণে পাঠ করার সুযোগ প্রদান করেছেন। কেননা কোন কোন লোকের পক্ষে বিশেষ পদ্ধতিতে অক্ষর বিশেষের উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সে সব লোক যদি তাদের পক্ষে সহজপাঠ্য এমন কোন উচ্চারণে সে শব্দটি পাঠ করে, তবে সে উচ্চারণও তাদের পক্ষে শুদ্ধ হবে। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিফার গোত্রের জলাশয়ের পাশে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি হুকুম পাঠিয়েছেন, আপনি যেন আপনার উম্মাতকে এই মর্মে

---

২২. আসবাবুন নুযূল, ওয়াহেদী, পৃষ্ঠা-৩৮

নির্দেশ প্রদান করেন, যেন তাদের সকলে একই উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আমি এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রার্থনা জানিয়ে বলছি যে, আমার উম্মাতের পক্ষে তা সম্ভব হবে না। উত্তর শুনে হযরত জিবরাঈল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি আপনার উম্মাতকে এ মর্মে নির্দেশ দিন, যেন তারা অনধিক দুই উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের দরখাস্ত পেশ করে বলছি, আমার উম্মাতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি উম্মাতকে এ মর্মে আদেশ দিন যেন তারা সর্বাধিক তিন উচ্চারণে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর বিশেষ ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করে বলছি, আমার উম্মাতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। জিবরাঈল (আ) এবারও ফিরে গেলেন এবং চতুর্থবার ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি হুকুম প্রেরণ করেছেন আপনি আপনার উম্মাতকে সাত উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিন। অনুমোদিত সে সাত উচ্চারণের মধ্যে যিনি যে উচ্চারণেই পাঠ করুন না কেন, তার তিলাওয়াতই শুদ্ধ বলে গ্রহণ করা হবে।[২৩]

এক হাদীসে রাসূল (সা) ইরশাদ করেন :

إن هذا القران انزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه.

নিশ্চয়ই এ কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের যার পক্ষে যেভাবে সহজ হয় সেভাবেই তিলাওয়াত কর। এ হাদীসে উল্লেখিত 'সাত হরফ'-এর অর্থ কী এ সম্পর্কে আলিমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিদগ্ধ আলিমগণের নিকট এ সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফ যে কিরাআতের সাথে নাযিল করেছেন, তার মধ্যে পারস্পরিক উচ্চারণ পার্থক্য সর্বাধিক সাত প্রকার হতে পারে। অনুমোদিত সে সাত প্রকার নিম্নে আলোচনা করা হল :

১। বিশেষ্যের উচ্চারণে তারতম্য। এতে এক বচন, দ্বি-বচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে। যেমন– এক কিরাআতে

---

২৩. মানাহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৩

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ এ আয়াতে 'কালেমাতু' শব্দটি এক বচনে এসেছে। কিন্তু অন্য কিরাআতে শব্দটি বহুবচনে উচ্চারিত হয়ে تَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ পঠিত হয়েছে।

২। ক্রিয়াপদে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতকালের বিভিন্নতা অবলম্বিত হয়েছে। যেমন– প্রচলিত কিরাআতে رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে। এ আয়াতের অন্য কিরাআতে رَبُّنَا بَاعَدَ بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে।

৩। রীতি অনুসারে এরাব চিহ্ন বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্যের কারণে কিরাআতে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– সূরা আল বাকারা : ২৮২ وَلَايُضَارَّ كَاتِبٌ এর স্থলে কেউ কেউ وَلَايُضَارُ كَاتِبٌ পাঠ করেছেন। অনুরূপ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدِ এর স্থলে ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ পাঠ করেছেন।

৪। কোন কোন কিরাআতে শব্দের কম-বেশিও হয়েছে। যেমন– تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ এর স্থলে কেউ কেউ مِنْ শব্দ বাদ দিয়ে تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ পাঠ করেছেন।

৫। কোন কোন কিরাআতে শব্দের আগ-পাছও হয়েছে। যেমন– এক কিরাআতে وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ এর স্থলে সূরা কাফ' (আয়াত নং-১৯) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ এসেছে। এখানে কিরাআতের পার্থক্যে 'হাক্ক' ও 'মাউত' (শব্দ দু'টি) আগে-পিছে হয়ে গেছে।

৬। শব্দের পার্থক্য হয়েছে। এক কিরাআতে এক শব্দ এবং অন্য কিরাআতে তদস্থলে অন্য শব্দ পঠিত হয়েছে। যেমন– সূরা আল বাকারা : ২৫৯ نُنْشِزُهَا এর স্থলে অন্য কিরাআতে نُنْشِرُهَا পঠিত হয়েছে। فَتَبَيَّنُوْا এর স্থলে فَتَثَبَّتُوْا এবং সূরা আল-ওয়াকিয়া : ২৯ طَلْحٍ এর স্থলে طَلْعٍ পঠিত হয়েছে।

৭। উচ্চারণ পার্থক্য, যেমন কোন কোন শব্দের উচ্চারণভঙ্গী লম্বা, খাটো, হালকা, কঠিন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না, শুধু উচ্চারণে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। যেমন– مُوْسٰى শব্দটি কোন কোন কিরাআতে مُوْسِى রূপে উচ্চারিত হয়েছে।[২৪]

মোটকথা উচ্চারণের সুবিধার্থে সাত কিরাআতের মাধ্যমে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে যেসব পার্থক্য অনুমোদন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অর্থের কোন উল্লেখযোগ্য

---

২৪. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৪, ৯৫

পরিবর্তন হয় না। শুধুমাত্র বিভিন্ন এলাকা ও শ্রেণী-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ-ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাত ধরনের উচ্চারণ-রীতির অনুমোদন করা হয়েছে।

সাত কিরাআতের ব্যাপারে উসমান (রা)-এর ভূমিকা

তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভুল বুঝাবুঝি দূর করার উদ্দেশ্যে উসমান (রা) কুরআন শরীফের সাতটি অনুলিপি তৈরী করেছিলেন। প্রতিটি অনুলিপি এমনভাবে লেখা হয়েছিল যে, এতে অনুমোদিত সাতটি কিরাআতই পাঠ করা সম্ভব হতো। তখনও পর্যন্ত আরবী লিখন-পদ্ধতিতে যের-যবর-পেশ প্রভৃতি হরকত-এর প্রচলন না থাকায় সাধারণ যের-যবর-পেশ-এর পার্থক্য পাঠকগণ নিজেরাই নির্ণয় করে নিতে পারতেন। যেসব ক্ষেত্রে শব্দের পরিবর্তন কিংবা অগ্রপশ্চাৎ অনুমোদিত রয়েছে, স্বতন্ত্র সাতটি নোসখাতে সে পার্থক্যগুলোও পৃথক পৃথকভাবে লিখে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে উম্মাতের আলিম-কারী ও হাফিযগণ কিরাআত-পদ্ধতিগুলো সংরক্ষণ করার ব্যাপারে এত শ্রম ও সাধনা নিয়োগ করেছেন যে, অনুমোদিত কিরাআত-রীতির বাইরে কোথাও নোকতার পার্থক্যও কুরআন-পাকের পাঠ-রীতিতে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। বিদগ্ধ আলিম-হাফিয-ক্বারীগণের অগণিত লোক সে যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ কিরাআত পদ্ধতির সুষ্ঠু সংরক্ষণের লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন।

উসমান (রা) তাঁর লিপিবদ্ধকৃত সাত কিরাআতের অনুলিপি মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করার সময় সাথে প্রতিটি কিরাআতের দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারীও প্রেরণ করতেন। সেসব কারী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপির অনুলিপির অনুরূপ পদ্ধতিতে কিরাআত শিক্ষা দান করতেন। এভাবেই বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীগণ অনুমোদিত কিরাআত-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল হয়ে যান। এসব শিক্ষক সাহাবীগণের নিকট থেকে যারা শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের অনেকেই ইলমে কিরাআত চর্চা এবং অন্যকে শেখানোর ব্যাপারে সমগ্র জীবন ওয়াকফ করে দেন। এভাবেই ইলমে-কিরাআত একটা স্বতন্ত্র বিষয়ের স্বীকৃতি লাভ করে।

কিরাআতের ক্ষেত্রে মূলনীতি

কিরাআতের পার্থক্যের ক্ষেত্রে যে কয়টি মূলনীতি সর্বসম্মতভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে, সংক্ষেপে সেগুলো নিম্নরূপ :

১. উসমান (রা) কর্তৃক লিপিবদ্ধ লিখন-পদ্ধতির সাথে প্রতিটি কিরাআত সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

২. আরবী ভাষার কাওয়ায়েদ বা ব্যাকরণের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৩. পদ্ধতিটি নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণিত এবং এ বর্ণনা ইল্‌মে কিরাআতের প্রসিদ্ধ কারীগণের মধ্যে পরিচিত হতে হবে।

কোন কিরাআতের মধ্যে যদি উপরোক্ত তিনটি শর্তের যে কোন একটির অভাব দেখা যায়, তবে সে শব্দ, বাক্য বা পঠন-পদ্ধতি আল-কুরআনের অংশরূপে কোন অবস্থাতেই গণ্য হবে না।

কিরাআতের ব্যাপারে আলিমগণের এ অনন্য সাবধানতার ফলে বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন কারীর কিরাআত সংরক্ষণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সংরক্ষণ-প্রচেষ্টার দ্বারাই বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণের বর্ণনা সূত্রের মাধ্যমে ইলমে কিরাআতের শুদ্ধতম পদ্ধতিগুলো যুগ পরম্পরায় চলে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে একই ইমাম বিভিন্ন পদ্ধতির কিরাআত আয়ত্ত করে তা শিক্ষা দান করতে থাকেন। অনেকে আবার বিশেষ এক ধরনের কিরাআতই আয়ত্ত করেন এবং তা শিক্ষা দান করতে থাকেন। ফলে সেই কিরাআত সংশ্লিষ্ট উস্তাদের নামে খ্যাত হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আলিমগণ কিরাআত-পদ্ধতিগুলোর খুঁটিনাটি সব দিক বিশ্লেষণ করে কিতাব লেখা শুরু করেন। সর্বপ্রথম ইমাম আবু ওবায়েদ কাসেম বিন সালাম, ইমাম আবু হাতিম সাজিস্তানী, কাজী ইসমাঈল ও ইমাম আবু জাফর আত্ তাবারী এই ইলম সম্পর্কে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আবু বাকর ইব্‌নুল মুজাহিদ (ওফাত ৩২৪ হিঃ) একটি প্রামাণিক কিতাব লিখেন। এই কিতাবে সাত কারীর কিরাআতই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তাঁর এই কিতাব এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, পরবর্তী যুগে তাঁর কিতাবে উল্লিখিত সাত কারীর কিরাআতই সর্বসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়।[২৫]

সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সাতজন কারী

ইমাম আবু বাকর ইবনুল মুজাহিদের কিতাব দ্বারা যে সাতজন কারী সর্বাপেক্ষা বেশি খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন :

---

২৫. মা'আরেফুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭

১. আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাসীর আদদারী (র) (ওফাত ১২০ হিঃ)। তিনি হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নুয যুবাইর (রা) ও হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা) এই তিনজন প্রখ্যাত সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তাঁর কিরাআত মক্কা শরীফে বেশি প্রচলিত হয়েছে। তাঁর কিরাআতের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে হযরত বাযযী (র) ও হযরত কানবাল (র) অধিকতর খ্যাতি লাভ করেছেন।

২. নাফে বিন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু নায়ীম (র) (ওফাত ১৬৯ হিঃ)। তিনি এমন সত্তর জন তাবে'ঈ থেকে ইলমে কিরাআত শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যাঁরা সরাসরি হযরত উবাই বিন কা'ব (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নুল আব্বাস (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর সহচর ছিলেন। তাঁর কিরাআত মদীনা শরীফে বেশি প্রসার লাভ করেছে। তাঁর বর্ণনাকারীগণের মধ্যে আবু মূসা কালুন (ওফাত ২২০ হিঃ) ও আবু সা'ঈদ দরশ (ওফাত ১৯৭ হিঃ) অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন।

৩. আবদুল্লাহিল হিসবী (ওফাত ১১৮হিঃ) ইব্‌ন আমের নামে খ্যাত। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে হযরত নু'মান ইবন বাশীর (রা) ও হযরত ওয়াছেলা ইব্‌ন আসকা (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। ইলমে কিরাআত হযরত মুগীরা ইব্‌ন শিহাব মাখযুমী থেকে হাসিল করেন। মুগীরা ইব্‌ন শিহাব হযরত উসমান (রা)-এর সাগরেদ ছিলেন। তাঁর কিরাআতের বেশি প্রচলন হয়েছে সিরিয়ায়। তাঁর বর্ণনাকারীগণের মধ্যে হিশাম ও যাকওয়ান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

৪. আবু 'আমর যাব্বান ইবন-আলা (ওফাত ১৫৪ হিঃ)। তিনি হযরত মুজাহিদ (রা) ও সা'ঈদ ইবনুল জুবাইর (রা)-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নুল আব্বাস (রা) ও হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কিরাআত বসরায় বেশি প্রসার লাভ করেছে। তাঁর বর্ণনাকারীগণের মধ্যে আবু উমারুদ-দুয়ালী (ওফাত ২৪৬ হিঃ) ও আবু শুয়াইব সূসীর (ওফাত ২৬১ হিঃ) খ্যাতি সমধিক।

৫. হামযা বিন হাবীব আয-যাইয়্যাত (ওফাত ১৮৮ হিঃ)। তিনি ইকরামা ইব্‌ন রবী আত-তাইমীর মুক্ত-করা ক্রীতদাস ছিলেন। সুলাইমান আল-আ'মাশ-এর সাগরেদ। সুলাইমান ইব্‌ন ওয়াসসার-এর নিকট থেকে, তিনি যার বিন হুবাইশ-এর নিকট থেকে এবং ইয়াহইয়া হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনাকারীগণের মধ্যে খালফ বিন হিশাম (ওফাত ১৮৮ হিঃ) ও খাল্লাদ বিন খালিদ (ওফাত ২২০ হিঃ) বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

৬. আসেম ইব্‌ন আবিননাজুদ আল-আসাদী (ওফাত ১২৭ হিঃ)। তিনি যার বিন হুবাইশ-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা), আবু আবদুর রহমান সুলাইমানের মাধ্যমে হযরত আলী (রা)-এর সাগরেদ। তাঁর কিরাআতের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে শা'বা ইব্‌ন আইয়্যাশ (ওফাত ১৯৩ হিঃ) ও হাফস বিন সুলাইমান (ওফাত ১৮০ হিঃ) অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। বর্তমানে হাফস বিন সুলাইমানের বর্ণিত কিরাআত পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত।

৭. আবুল হাসান আলী ইব্‌ন হামযা আল-কাসয়ী (র) (ওফাত ১৮৯ হিঃ)। তিনি আরবী ভাষার প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ। তাঁর বর্ণনাকারীগণের মধ্যে আবুল হারিস মারওয়াযী (ওফাত ২৪০ হিঃ) ও আবু উমারুদ দাওরী সমধিক প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত তিন জনের কিরাআত প্রধানত কুফা এলাকায় প্রচলিত হয়েছিল।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

আল-কুরআন যেহেতু একসাথে নাযিল হয়নি, বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনমত অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে, এজন্যে নবুওয়াত যুগে আল-কুরআনকে গ্রন্থাকারে একত্রে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এজন্যে প্রথম প্রথম আল-কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে হিফয বা কণ্ঠস্থ করার প্রতিই বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল।

রাসূল (সা)-এর যুগে প্রথমাবস্থায় যখন ওহী নাযিল হতো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর শব্দগুলো সাথে সাথে দ্রুত আবৃত্তি করতে থাকতেন, যেন সেগুলো অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল-কিয়ামায় আয়াত নাযিল হলো, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, কুরআন কণ্ঠস্থ করার জন্য ওহী নাযিল হতে থাকা অবস্থায় শব্দগুলো দ্রুত সাথে সাথে উচ্চারণ করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলাই আপনার মধ্যে এমন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যে, একবার ওহী নাযিল হওয়ার পর তা আর আপনি ভুলতে পারবেন না। তাই ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যেতো। এভাবেই রাসূল (সা) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সিনা কুরআন মাজীদের এমন সুরক্ষিত ভাণ্ডারে পরিণত হয় যে, তন্মধ্যে সামান্যতম সংযোগ-বিয়োগ কিংবা ভুল-চুক হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। এর পরও অধিকতর সাবধানতার খাতিরে প্রতি বছর রমযান মাসে তিনি সে পর্যন্ত নাযিলকৃত সমগ্র আল-কুরআন হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তিলাওয়াত করে শোনাতেন, হযরত জিবরাঈল

(আ)-এর নিকট থেকেও শুনে নিতেন। ওফাতের বছর রমযানে রাসূল (সা) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'দু'বার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে শোনান এবং জিবরাঈল (আ) থেকে শুনেন।[২৬]

সাহাবায়ে কিরামের মুখস্থকরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে প্রথমে আল-কুরআনের আয়াতগুলো মুখস্থ করাতেন, তারপর আয়াতের মর্মার্থ শিক্ষা দিতেন। তাঁদের এমন প্রবল আগ্রহ ছিল যে, প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন। অনেক মহিলা পর্যন্ত বিবাহের মোহরানা বাবদ এরূপ দাবি পেশ করতেন যে, স্বামীরা তাদেরকে শুধু কুরআন শরীফের তা'লীম দেবেন, এ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। শত শত সাহাবী সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে শুধুমাত্র কুরআনের তা'লীম গ্রহণ করার সাধনাতেই জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা কুরআন শরীফ কেবল মুখস্থই করতেন না, নিয়মিত রাত জেগে নফল নামাযে তিলাওয়াতও করতেন।

হযরত উবাদা ইব্নুস সামিত (রা) বর্ণনা করেন যে, মক্কা থেকে কেউ হিজরাত করে মদীনায় এলেই তাকে কুরআনের তা'লীম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কোন একজন আনসারের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হতো। মসজিদে নববীতে সর্বক্ষণ আল-কুরআন শিক্ষা দান ও তিলাওয়াতের শব্দ এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করতে হয় যে, সবাই যেন আরো আস্তে কুরআন পাঠ করেন, যাতে পরস্পরের তিলাওয়াতের মধ্যে বাধা সৃষ্টি না হয়।[২৭]

সীমাহীন আগ্রহ ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে খুব অল্প দিনেই সাহাবীগণের মধ্যে একদল হাফিযে কুরআন তৈরী হয়ে গেলেন। এ জামা'আতের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন বা প্রথম চার খলীফা ছাড়াও হযরত তালহা (রা), হযরত সালেম (রা), হযরত ইব্ন মাসউদ (রা), হযরত হুযাইফা ইব্নুল ইয়ামান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্নুল আব্বাস (রা), আমর ইবনুল আস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা), হযরত মুয়াবিয়া (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্নুয্ যুবাইর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সায়েব (রা), হযরত আয়িশা (রা), হযরত

২৬. বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-৬
২৭. মানহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৪

হাফসা (রা) ও হযরত উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

মোটকথা, প্রাথমিক অবস্থায় কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হিফয-এর প্রতিই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। কারণ তখন লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বই-পুস্তক প্রকাশের উপযোগী ছাপাখানা এবং অন্য কোন উপকরণের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং সে অবস্থায় যদি শুধু লেখার উপর নির্ভর করা হতো, তবে আল-কুরআন সংরক্ষণ যেমন জটিল সমস্যা হয়ে পড়তো, তেমনি ব্যাপক প্রচারের দিকটিও নিঃসন্দেহে অসম্ভব হয়ে যেতো। তাছাড়া আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল এমন প্রখর যে, এক এক ব্যক্তি হাজার হাজার কবিতা গাঁথা মুখস্থ করে রাখত। মরুভূমির বেদুঈনরা পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে তাদের পরিবার ও গোত্রের কুষ্ঠিনামা প্রভৃতি মুখস্থ করে রাখত এবং যত্রতত্র তা অনর্গল বলে যেতো। আল-কুরআন হিফাযাতের কাজে সেই অনন্য স্মৃতিশক্তিকেই কাজে লাগানো হয়েছে।

হিফযের মাধ্যমেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে আল-কুরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।[২৮]

ওহী লিপিবদ্ধকরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআন সাহাবায়ে কিরামকে মুখস্থ করানোর পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করে রাখারও বিশেষ সুব্যবস্থা করেছিলেন। বিশিষ্ট কয়জন লেখাপড়া জানা সাহাবীকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করে রাখা হয়েছিল। হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) বর্ণনা করেন, আমি ওহী লিখে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। যখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হতো, তখন সর্ব শরীরে মুক্তার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিত। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমি দুম্বার চওড়া হাড় অথবা লিখন উপযোগী অন্য কোন কিছু নিয়ে হাযির হতাম। লেখা শেষ করার পর আল-কুরআনের ওজনে আমার শরীরে এমন অনুভূত হতো যে, আমার পা ভেঙ্গে পড়তো, মনে হতো আমি যেন চলনশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। লেখা শেষ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, যা লিখেছ আমাকে পড়ে শুনাও। আমি লিখিত অংশ পড়ে শুনাতাম। কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তিনি তৎক্ষণাত তা শুদ্ধ করে দিতেন। এরপর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্যদের সামনে তিলাওয়াত করতেন।[২৯]

---

২৮. মা'আরেফুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১
২৯. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৬

ওহীর লিখকবৃন্দ

হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) ছাড়াও যাঁরা ওহী লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম চার খলীফা, হযরত উবাই ইব্ন কা'ব, হযরত আয্ যুবাইর ইব্নুল আওয়াম, হযরত মু'আবিয়া, হযরত আব্বাস ইব্ন সা'ঈদ, আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা, ইব্ন মাসউদ, খালিদ ইব্নুল ওয়ালিদ, মুগীরা ইব্ন শু'বা ও হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।[৩০]

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কোন আয়াত নাযিল হওয়ার পর পরই ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত সাহাবীকে ডেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি কোন সূরায় কোন আয়াতের পর সংযোজিত হবে তা বলে দিতেন এবং সেভাবেই তা লিপিবদ্ধ করা হতো।[৩১]

যে সব জিনিসে ওহী লিখা হত

সে যুগে আরবে যেহেতু কাগজ খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল, এজন্য আল-কুরআনের আয়াত প্রধানত পাথর-শিলা, শুকনা চামড়া, খেজুর গাছের শাখা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং পশুর হাড়ের উপর লেখা হতো। কোন কোন সময় কেউ কেউ কাগজের টুকরা ব্যবহার করেছেন বলেও জানা যায়।[৩২]

লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে এমন একটি ছিল, যেটি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সেটি পরিপূর্ণভাবে কিতাব আকারে না হয়ে পাথর-শিলা, চামড়া প্রভৃতির ওপর লিপিবদ্ধ ছিল। সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু আয়াত এবং সূরা লিখে রেখেছিলেন। ব্যক্তিগত লিখনের রেওয়াজ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। হযরত উমার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির হাতে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতসম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি ছিল প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৩]

---

৩০. ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮, যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০
৩১. ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮
৩২. ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১
৩৩. মা'আরেফুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২

আবু বাকর (রা)-এর যুগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে চামড়া, হাড়, পাথর-শিলা, গাছের পাতা প্রভৃতিতে লিখিত কুরআন শরীফের নোসখা একত্র করে পরিপূর্ণ কিতাবের আকারে সংকলিত করার তাকিদ প্রথম খলীফা হযরত আবু বাকর (রা)-এর যুগেই অনুভূত হয়। সাহাবীগণ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যেসব অনুলিপি তৈরী করেছিলেন, সেগুলো পূর্ণাঙ্গ ছিল না। অনেকেই আবার আয়াতের সাথে তাফসীরও লিখে রেখেছিলেন। হযরত আবু বাকর (রা) সবগুলো বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি একত্রিত করে পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি তৈরীর কারণ

কি কারণে হযরত আবু বাকর (রা) আল-কুরআনের একটি পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি তৈরী করে সংরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করে ছিলেন, সে সম্পর্কে হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) বর্ণনা করেন : ইয়ামামার যুদ্ধের পর একদিন হযরত আবু বাকর (রা) আমাকে জরুরী তলব করলেন। আমি সেখানে পৌছলে আবু বাকর (রা) বলেন, "উমার (রা) এসে আমাকে বলছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফিযে-কুরআন শহীদ হয়ে গেছেন। এমনিভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে যদি হাফিয সাহাবীগণ শহীদ হতে থাকেন, তবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়, যখন আল-কুরআনের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সে মতে আমার অভিমত হচ্ছে, অনতিবিলম্বে আপনি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করে আল-কুরআন একত্রে সংকলিত করার ব্যবস্থা করুন। আমি হযরত উমার (রা)-কে বলেছি যে কাজ হযরত রাসূল (সা) করেন নি, সে কাজ আমার পক্ষে করা সমীচীন হবে কিনা? হযরত উমার (রা) উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম, এ কাজ হবে খুবই উত্তম। একথা তিনি বারবার বলতে থাকায় আমার মনও এ ব্যাপারে সায় দেয়।" অতঃপর হযরত আবু বাকর (রা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি তীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্যমী যুবক, তোমার সততা ও সাধুতা সম্পর্কে কারো কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে তুমি ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজ করেছ। সুতরাং তুমিই বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে আল-কুরআনের বিক্ষিপ্ত সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করে লিখতে শুরু কর।"

হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, তাঁরা যদি আমাকে একটি পাহাড় স্থানান্তর করার নির্দেশ দিতেন তবুও বোধ হয় তা আমার পক্ষে

এতটুকু কঠিন বলে মনে হত না, যত কঠিন মনে হতে লাগলো আল-কুরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করার কাজটি। আমি নিবেদন করলাম, আপনি কি করে সে কাজ করতে চান, যে কাজ স্বয়ং রাসূল (সা) করেননি! হযরত আবু বাকর (রা) উত্তর দিলেন, আল্লাহর কসম, এ কাজ খুবই উত্তম হবে। বারবার তিনি আমাকে একই কথা বলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ কাজের যথার্থতা সম্পর্কে আমার মনেও প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন। এরপর থেকেই আমি খেজুরের ডাল, পাথর, হাড়, চামড়া প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন সূরা ও আয়াত একত্রিত করতে শুরু করলাম। লোকজনের স্মৃতিতে সংরক্ষিত আল-কুরআনের সাথে যাচাই করে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ সমাপ্ত করলাম।[৩৪]

যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) কর্তৃক আল-কুরআন সংকলনের পদ্ধতি

যায়িদ (রা) নিজে হাফিযে কুরআন ছিলেন। তিনি জমাকৃত পাণ্ডুলিপিগুলো যাচাই করার জন্য নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

১. সর্বপ্রথম তিনি তাঁর স্মৃতিতে রক্ষিত আল-কুরআনের সাথে সেগুলো মিলিয়ে দেখতেন।

২. উমারও (রা) হাফিযে কুরআন ছিলেন। হযরত আবু বাকর (রা) তাঁকেও হযরত যায়িদ (রা)-এর সঙ্গে এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরা যৌথভাবেই লিখিত নোসখাগুলো গ্রহণ করতেন এবং একজনের পর অন্যজন স্ব-স্ব স্মৃতির সঙ্গে যাচাই করতেন।

৩. এমন কোন লিখিত আয়াতই গ্রহণ করা হতো না, যে পর্যন্ত অন্তত দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য না দিতেন যে, এগুলো স্বয়ং রাসূল (সা)-এর সামনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।[৩৫]

৪. অতঃপর লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হতো।[৩৬]

মোটকথা, যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) অসাধারণ সাবধানতার সাথে কুরআন শরীফের পরিপূর্ণ নোসখা তৈরী করে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন।[৩৭]

---

৩৪. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৬, ১৭৭
৩৫. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৮
৩৬. আল-বুরহান, ফী উলুমিল কুরআন, যারাকশী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৮
৩৭. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৮

কিন্তু যেহেতু প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক করে লেখা হয়েছিল, এ জন্য সেটি অনেকগুলো 'সহীফায়' বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখনকার পরিভাষায় এ সহীফাগুলো 'উম্ম' বা মূল পাণ্ডুলিপি বলে আখ্যায়িত করা হতো। এ পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ

১. আয়াতগুলো রাসূল (সা)-এর নির্দেশিত ধারায় লিপিবদ্ধ করা হলেও সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা ছিল না। প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক লিখিত হয়েছিল।[৩৮]

২. এ নোসখায় পূর্ববর্ণিত কুরআনের সাতটি কিরাআতই সন্নিবেশিত হয়েছিল।[৩৯]

৩. যেসব আয়াতের তিলাওয়াত প্রচলিত ছিল সবগুলো আয়াতই এতে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

৪. নোসখাটি এ উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল, যেন প্রয়োজনবোধে উম্মাতের সবাই এটি থেকে নিজ নিজ নোসখা শুদ্ধ করে নিতে পারেন।

হযরত আবু বাকর (রা)-এর উদ্যোগে সংকলিত এ নোসখাটি তাঁর কাছেই রক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর এটি হযরত উমার (রা) নিজের হিফাযাতে নিয়ে নেন। হযরত উমার (রা)-এর শাহাদাতের পর নোসখাটি উম্মুল-মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে রক্ষিত থাকে। শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সূরার তারতীব অনুসারে লিখন পদ্ধতিসহ আল-কুরআনের সর্বসম্মত নোসখা প্রস্তুত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করার পর হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট রক্ষিত নোসখাটি বিলুপ্ত করে ফেলা হয়। কেননা তখন সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতি ও সূরার তারতীববিহীন কোন নোসখা অবশিষ্ট থাকলে সর্বসাধারণের পক্ষে বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল বলেই এরূপ করা হয়েছিল।[৪০]

উসমান (রা)-এর যুগ

উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ইসলাম আরবের সীমান্ত অতিক্রম করে ইরান ও রোমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নতুন এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর যেসব মুজাহিদ কিংবা বণিকের মাধ্যমে তাঁরা ইসলামের দাওয়াত লাভ করেন, তাঁদের নিকটই আল-কুরআন শিক্ষা করতেন। ইতোপূর্বে

---

৩৮. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৭
৩৯. আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২১
৪০. ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬

বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন শরীফ সাত হরফ বা কিরাআতে নাযিল হয়েছিল। সাহাবীগণও রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে বিভিন্ন কিরাআতেই আল-কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করেছিলেন। সেজন্য প্রত্যেক সাহাবীই যে কিরাআতে শিক্ষা করেছিলেন সে কিরাআতই স্ব স্ব অনুসারীদের শিক্ষা দেন। এভাবেই বিভিন্ন কিরাআত পদ্ধতিও বহু দূরদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব এলাকার লোকেরা এ তথ্য অবগত ছিলেন যে, আল-কুরআন সাত কিরাআত পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে, সেসব এলাকায় কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু দূর-দূরান্তের লোকদের কাছে আল-কুরআনের বিভিন্ন কিরাআত ইত্যাদি সম্পর্কিত পূর্ণ তথ্য ও জ্ঞানের অপ্রতুলতা হেতু কোথাও কোথাও কিরাআতের পার্থক্যকে কেন্দ্র করে নানা মতভেদ এমনকি ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত আরম্ভ হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কিরাআত পদ্ধতিকে শুদ্ধ এবং অন্যদের কিরাআতকে ভুল বলে চিহ্নিত করতে শুরু করে। ফলে ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয় এবং রাসূল (সা) থেকে বহুল সমর্থিত, নিঃসন্দেহ বর্ণনা-সূত্রে প্রাপ্ত, কিরাআত রীতিকে ভুল অভিহিত করার গুনাহ থেকে মানুষকে রক্ষা এবং পারস্পরিক মতবিরোধের আশু একটা সুষ্ঠু সমাধান অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন পর্যন্ত মদীনা শরীফে রক্ষিত যায়িদ বিন সাবিত (রা) কর্তৃক লিখিত নোসখা ব্যতীত অন্য কারো নিকট এমন কোন নোসখা ছিল না, যা দলীলরূপে দাঁড় করানো যেতে পারে। কেননা অন্য যেসব নোসখা ছিল সেগুলো যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরী হয়েছিল সেহেতু সেগুলোর লিখন পদ্ধতিতে সবগুলো শুদ্ধ কিরাআত উল্লেখিত থাকত না। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা ছিল এমন এক লিপি-পদ্ধতি অবলম্বন করা যার মাধ্যমে সাত কিরাআতেরই তিলাওয়াত সম্ভব হয় এবং কিরাআতের ক্ষেত্রে কোন মতভেদ দেখা দিলে সে নোসখা দেখে মীমাংসা করে নেওয়া যায়। হযরত উসমান (রা) তাঁর খিলাফতের যমানায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করে গেছেন। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করার যে পটভূমি হদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

হুযাইফা ইব্নুল ইয়ামান (রা) আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান এলাকায় জিহাদে নিয়োজিত হন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন যে, আল-কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে নানা ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। তখন মদীনায় ফিরে এসেই তিনি সোজা হযরত উসমান (রা)-এর দরবারে হাযির হলেন এবং নিবেদন করলেন, আমীরুল মু'মিনীন! এ উম্মাত আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে ইহুদী-

নাসারাদের ন্যায় মতভেদের শিকারে পরিণত হওয়ার আগেই আপনি এর একটা সুষ্ঠু প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করুন।

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর হযরত উসমান (রা) এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে একত্রিত করলেন। সকলকে লক্ষ্য করে বললেন : আমি শুনতে পেরেছি যে, এক শ্রেণীর লোক অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলছে যে, আমাদের কিরাআত তোমাদের চাইতে উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ। অথচ এ ধরনের মন্তব্য কুফরের পর্যায় পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে। সুতরাং এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনারা কি পরামর্শ দেন?

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ সম্পর্কে কি চিন্তা করছেন? হযরত উসমান (রা) বললেন, আমার অভিমত হচ্ছে, সকল শুদ্ধ বর্ণনা একত্রিত করে এমন একটা সর্বসম্মত নোসখা তৈরী করা কর্তব্য, যাতে কিরাআত-পদ্ধতির মধ্যেও কোন মতভেদের অবকাশ না থাকে। সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা)-এর অভিমত সমর্থন করলেন এবং এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করার অঙ্গীকার করলেন।

এরপর হযরত উসমান (রা) সর্বশ্রেণীর লোককে সমবেত করে একটি জরুরী ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, আপনারা মদীনা শরীফে আমার অতি নিকটে বসবাস করেও কুরআন শরীফের ব্যাপারে একে অন্যকে দোষারোপ ও মতভেদ করছেন। এতেই বুঝা যায় যে, যারা আমার থেকে দূরতম এলাকায় বসবাস করেন, তাঁরা এ ব্যাপারে আরো বেশি মতভেদ এবং ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়েছেন। সুতরাং আসুন, আমরা সকলে মিলে আল-কুরআনের এমন একটি লিখিত নোসখা তৈরী করি, যাতে মতভেদের কোন সুযোগ থাকবে না এবং সবার পক্ষেই সেটি অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

এ উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা) সর্বপ্রথম উম্মুল-মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর কাছ থেকে হযরত আবু বাকর (রা) কর্তৃক লিপিবদ্ধ 'মাছহাফগুলো' চেয়ে নিলেন। এগুলো সামনে রেখে সূরার তারতীবসহ আল-কুরআনের শুদ্ধতম 'মাছহাফ' তৈরী করার উদ্দেশ্যে আল-কুরআন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত চারজন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নুয্‌ যুবাইর (রা) হযরত সা'ঈদ ইবনুল-আস (রা) ও হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন হিশাম (রা) সমন্বয়ে গঠিত কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল হযরত আবু বাকর (রা) কর্তৃক সংকলিত মাছহাফকেই

শুধুমাত্র এমন একটা সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা, যে লিপির সাহায্যে প্রতিটি শুদ্ধ কিরাআত-পদ্ধতি অনুযায়ীই তিলাওয়াত করা সম্ভব হয়। দায়িত্ব প্রাপ্ত চারজন সাহাবীর মধ্যে হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন আনসার (রা) এবং বাকী তিনজন কুরাইশ। হযরত উসমান (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি লিখন-পদ্ধতির ব্যাপারে হযরত যায়িদ (রা)-এর সাথে অন্য তিনজনের মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে কুরাইশদের লিপি-পদ্ধতি অনুসরণ করবে। কারণ আল-কুরআন যাঁর প্রতি নাযিল হয়েছিল, তিনি নিজে কুরাইশ ছিলেন। কুরাইশদের ব্যবহৃত ভাষাই আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক আল-কুরআন লিপিবদ্ধকরণ

প্রাথমিকভাবে চারজন সাহাবীকে লেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও অন্যান্য অনেককেই তাঁদের সাথে সাহায্যকারী হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা আল-কুরআন লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করেন।

১. হযরত আবু বাক্‌র (রা)-এর উদ্যোগে যে লিখিত নোসখাটি তৈরী করা হয়েছিল, তাতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে না সাজিয়ে প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক নোসখায় লিখিত হয়েছিল। তাঁরা সবগুলো সূরাকে ক্রমানুপাতে একই 'মাছহাফ'-এ সাজিয়ে দেন।[৪১]

২. আয়াতগুলো এমন এক লিখন-পদ্ধতি অনুসরণে লেখা হয়, যাতে সবগুলো শুদ্ধ কিরাআত-পদ্ধতিতেই তা পাঠ করা যায়। এ কারণেই অক্ষরগুলোর মধ্যে নোকতা এবং যের-যবর-পেশ সংযুক্ত হয়নি।[৪২]

৩. তখন পর্যন্ত আল-কুরআনের সর্বসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য একটি মাত্র নোসখা ছিল। তাঁরা একাধিক নোসখা তৈরী করেন। সাধারণ বর্ণনামতে হযরত উসমান (রা) পাঁচটি নোসখা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু আবু হাতিম সিজিস্তানী (রা)-র মতে সাতটি নোসখা তৈরী হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে একটি মক্কায়, একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়ামানে, একটি বাহরাইনে, একটি বসরায় এবং একটি কুফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অবশিষ্ট একটি নোসখা বিশেষ যত্ন সহকারে মদীনায় সংরক্ষিত হয়েছিল।[৪৩]

---

৪১. মুসতাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৯
৪২. মানহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৪
৪৩. ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা--১৭

৪. লেখার ব্যাপারে তাঁরা প্রধানত হযরত আবু বাক্র (রা)-এর সময় লিখিত নোসখা অনুসরণের সাথে অধিকতর সাবধানতাবশত ঐ সমস্ত পদ্ধতিও অনুসরণ করেন যা হযরত আবু বাক্র (রা)-এর সময় মূল পাণ্ডুলিপি তৈরী করার সময় অনুসৃত হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় লিখিত যে সমস্ত অনুলিপি সাহাবীগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল, সেগুলোও পুনরায় একত্রিত করা হয়। মূল অনুলিপির সাথে সেসব অনুলিপিও নতুনভাবে যাচাই করে দেখা হয়।

৫. পবিত্র আল-কুরআনের এ সর্বসম্মত মাছহাফ তৈরী হওয়ার পর সমগ্র উম্মাত এ মাসহাফ-এর ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর হযরত উসমান (রা) পূর্বেকার বিক্ষিপ্ত সকল নোসখা আগুনে পুড়িয়ে দেন। কেননা এরপরও ব্যক্তিগত ও অবিন্যস্তভাবে লিখিত নোসখাগুলো অবশিষ্ট থাকতে দিলে সূরার ক্রমানুপাতিক গ্রন্থনা এবং সর্বসম্মত প্রতিটি কিরাআতে পাঠোপযোগী লিখন-পদ্ধতির ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্ট হওয়ার পরও পুনরায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা অবশিষ্ট থেকে যেতো। হযরত উসমান (রা)-এর এ কাজকে সমগ্র উম্মাত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম সর্বসম্মতভাবে এ কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।[৪৪]

তিলাওয়াত সহজকরণ

হযরত উসমান (রা) কর্তৃক মাসহাফ তৈরীর কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর সমগ্র উম্মাত ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, হযরত উসমান (রা) অনুসৃত লিখন পদ্ধতি ব্যতীত আল-কুরআন অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা জায়েয নয়। ফলে পরবর্তীতে সমস্ত মাছহাফ'ই হযরত উসমান (রা)-এর লিখন পদ্ধতি অনুসরণে লিখিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'ঈগণ হযরত উসমান (রা)-এর তৈরী করা মাছহাফ-এর অনুলিপি তৈরী করেই দুনিয়ার সর্বত্র কুরআন ব্যাপকভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যেহেতু মূল উসমানী অনুলিপিতে নোক্তা ও যের-যবর-পেশ ছিল না সে জন্য অনারবদের পক্ষে এ মাছহাফ-এর তিলাওয়াত অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর ছিল। ইসলাম দ্রুত আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে উসমানী অনুলিপিতে নোক্তা ও যের-যবর-পেশ সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে শুরু করে। সর্বসাধারণের জন্য তিলাওয়াত সহজতর করার লক্ষ্যে মূল উসমানী মাছহাফ-এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। সংক্ষেপে প্রক্রিয়াগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

---

৪৪. ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫

নোক্তা

প্রাচীন আরবদের মধ্যে হরফে নোক্তা সংযোজন করার রীতি প্রচলিত ছিল না। বস্তুত তখনকার দিনের লোকদের পক্ষে নোক্তাবিহীন লিপি পাঠ করার ব্যাপারে কোন অসুবিধাও হতো না। প্রসঙ্গ ও চিহ্ন দেখেই তাঁরা বাক্যের পাঠোদ্ধার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। আল-কুরআনের ব্যাপারে আদৌ কোন অসুবিধার আশংকা এ জন্য ছিল না যে, আল-কুরআন তিলাওয়াত মোটেই অনুলিপি নির্ভর ছিল না। হাফিযগণের তিলাওয়াত থেকেই লোকেরা তিলাওয়াত শিক্ষা করতেন। হযরত উসমান (রা) মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় আল-কুরআনের মাছহাফ প্রেরণ করার সময় সাথে বিশিষ্ট তিলাওয়াতকারী হাফিযও প্রেরণ করেছিলেন, যেন লোকজনকে মাসহাফের পাঠোদ্ধারের ব্যাপারে তাঁরা পথপ্রদর্শন করতে পারেন। আল-কুরআনে হরফসমূহে সর্বপ্রথম নোকতার প্রচলন কে করেছিলেন, এ সম্পর্কিত বর্ণনায় মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন বর্ণনাকরীর মতে এ কাজ বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ তাবে'ঈ হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী (র) আনজাম দেন। (আল বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫০) অনেকের মতে আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী এ কাজ হযরত আলী (রা)-এর নির্দেশে আনজাম দিয়েছিলেন। কারো কারো মতে কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ ইব্ন সুফিয়ান আবুল-আসওয়াদ (র)-কে দিয়ে এ কাজ করিয়েছিলেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ হযরত হাসান বসরী (র), হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ামার (র) ও হযরত নসর ইব্ন আসেম লাইসী (র)-এর দ্বারা এ কাজ করিয়েছিলেন।[৪৫]

হরকত

নোক্তার ন্যায় প্রথম অবস্থায় আল-কুরআনে হরকত বা যের-যব-পেশ ইত্যাদিও ছিল না। সর্বপ্রথম কে হরকত-এর প্রবর্তন করেছেন এ ব্যাপারেও বিরাট মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী (র) হরকত প্রবর্তন করেন। আবার অনেকেরই অভিমত হচ্ছে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ামার ও নসর ইব্ন আসেম লাইসীর দ্বারা একাজ করিয়েছিলেন।[৪৬]

এ সম্পর্কিত সবগুলো বর্ণনা একত্রিত করে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, কুরআন শরীফের জন্য হরকত সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালীই

---

৪৫. তাফসীরে কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬
৪৬. কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৩

(র) আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত হরকতসমূহ আজকাল প্রচলিত হরকতের মত ছিল না। বরং যবর দিতে হলে হরফের উপরিভাগে একটা নোক্তা এবং যের দিতে হলে নীচে একটা নোক্তা বসিয়ে দেওয়া হতো। অনুরূপ পেশ-এর উচ্চারণ করার জন্য হরফের সামনে একটা নোক্তা ও তানবীন-এর জন্য দু'টি নোকতা ব্যবহার করা হতো। আরো কিছুকাল পরে খলীল ইবন আহমদ (র) হামযা ও তাশদীদের চিহ্ন তৈরী করেন।[৪৭]

এরপর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ উদ্যোগী হয়ে হযরত হাসান বসরী (র), ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ামার ও নসর ইব্ন আসেম লাইসী প্রমুখকে আল-কুরআনে নোকতা ও হরকত প্রদানের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। হরকতগুলোকে আরো সহজবোধ্য করার জন্য উপরে, নিচে বা পাশে অতিরিক্ত বিন্দু ব্যবহার করার হযরত আবুল আসওয়াদ প্রবর্তিত পদ্ধতির স্থলে বর্তমান আকারের হরকতের প্রবর্তন করা হয়, যেন হরফের নোকতার সঙ্গে হরকতের নোকতার সংমিশ্রণে জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

মান্যিল

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'ঈগণের অনেকেই সপ্তাহে অন্তত একবার পুরো আল-কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এ জন্য তাঁরা দৈনিক তিলাওয়াতের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। সে পরিমাণকেই 'হিযব' বা মানযিল বলা হতো। এ কারণেই আল-কুরআন সাত মানযিলে বিভক্ত হয়েছে।[৪৮]

পারা

আল-কুরআন সমান ত্রিশটি খণ্ডে বিভক্ত। এ খণ্ডগুলোকে 'পারা' বলে অভিহিত করা হয়। পারার এ বিভক্তি অর্থ বা বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়। বরং পাঠ করার সুবিধার্থে সমান ত্রিশটি খণ্ড করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটা প্রসঙ্গের মাঝখানেই এক পারা শেষ হয়ে নতুন পারা আরম্ভ হয়ে গেছে। ত্রিশ পারায় বিভক্তি কার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, সে তথ্য উদ্ধার করা কঠিন। অনেকের ধারণা হযরত উসমান (রা) যখন কুরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী করেন, তখন এ ধরনের ত্রিশটি খণ্ডে তা লিখিত হয়েছিল এবং তা

---

৪৭. সুবহুল আছা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬০, ১৬১
৪৮. আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫০

থেকেই ত্রিশ পারার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের কোন নির্ভরযোগ্য আলিমের কিতাবেই আমরা এ তথ্যের সমর্থন পাইনি। আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (র) লিখেন, আল-কুরআনের ত্রিশ পারা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে বিশেষত মাদরাসায় শিশুদেরকে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রেই এ ত্রিশ পারার রেওয়াজ বেশি চলে আসছে।[৪৯]

কয়েকটি যতিচিহ্ন

শুদ্ধ তিলাওয়াতের সুবিধার্থে আয়াতের মধ্যে কয়েক প্রকারের যতিচিহ্নের প্রচলন করা হয়েছে। এ চিহ্নগুলোর দ্বারা কোথায় থামতে হবে, কোন জায়গায় কিছুটা শ্বাস নেওয়া যাবে, এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী জানা যায়। এ চিহ্নগুলোকে পরিভাষায় 'রুমুযে আওকাফ' বলা হয়। এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন আরবী না-জানা লোকও যেন সহজে বুঝতে পারেন, কোথায় কতটুকু থামতে হবে, কোনখানে থামলে অর্থের বিকৃতি ঘটতে পারে। এ চিহ্নগুলোর অধিকাংশ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন তাইফুর সাজওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল।[৫০]

চিহ্নগুলো নিম্নরূপ :

ط = 'ওয়াক্‌ফ মতলাক' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ বাক্য পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে থামাটাই উত্তম।

ج = 'ওয়াক্‌ফ-জায়েয' শব্দের সংক্ষেপ। এর অর্থ এখানে থামা যেতে পারে।

ز = 'ওয়াক্‌ফ-মুজাওয়ায'-এর সংক্ষেপ। এর অর্থ এখানে থামা যেতে পারে, তবে না থামাই উত্তম।

ص = 'ওয়াক্‌ফ-মুরাখ্‌খাছ'- এর সংক্ষেপ। এর অর্থ এখানে আয়াত শেষ হয়নি। তবে বাক্য যেহেতু দীর্ঘ হয়ে গেছে, তাই যদি দম নেওয়ার জন্য থামতে হয়, তবে এখানেই থামা উচিত।

م = 'ওয়াক্‌ফ-লাযেম'-এর সংক্ষেপ। এর অর্থ যদি এখানে থামা না হয়, তবে অর্থের মধ্যে মারাত্মক ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এখানে থামাই উত্তম। কেউ কেউ একে ওয়াকফে-ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু এ ওয়াজিবের অর্থ

---

৪৯. আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫০.মানাহেলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০২
৫০. আন-নশরু ফী কিরা'আতিল-আশর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৫

এ নয় যে, এখানে না থামলে গুনাহ হবে। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতগুলো যতিচিহ্ন রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এখানে থামাই সর্বোত্তম।[৫১]

لا = 'লা তাকেফ' শব্দের সংক্ষেপ। এর অর্থ এখানে থামা যাবে না। তবে থামা একেবারেই নাজায়েয, তা নয়। বরং এ চিহ্ন-বিশিষ্ট এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে থামা মোটেও দোষের নয় এবং এর পরবর্তী শব্দ থেকে আয়াতের তিলাওয়াত শুরু করা যেতে পারে। তবে এখানে থামলে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় পুনরায় আগের আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম।[৫২]

উপরিউক্ত যতিচিহ্নগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করেই বলা চলে যে, এগুলো আল্লামা সাজাওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত। কিন্তু এগুলো ছাড়া আরো কয়েকটি চিহ্ন কুরআনের আয়াতের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

مع = 'মুয়ানাকা' শব্দের সংক্ষেপ। যে আয়াতে দু'ধরনের তাফসীর হতে পারে, সেরূপ স্থানে এ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক তাফসীর অনুযায়ী এখানে বাক্য শেষ এবং অন্য তাফসীর অনুযায়ী পরবর্তী চিহ্নে বাক্য শেষ বুঝায়। সুতরাং দু'জায়গার যে কোন এক স্থানে থামা যেতে পারে। তবে এক জায়গায় থামার পর পরবর্তী চিহ্নটিতে থামা জায়েয হবে না।

سكتة - চিহ্নটির নির্দেশ হচ্ছে শ্বাস না ছেড়ে কিছুটা থামা দরকার। যেখানে একটু না থেমে পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে অর্থের ব্যাপারে ভুল বুঝার অবকাশ রয়েছে, এধরনের জায়গায় চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়।

وقفة - এ চিহ্নযুক্ত স্থানে সাকতার চাইতে একটু বেশী সময় থামতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শ্বাস ছুটে না যায়।

ق - কারো কারো মতে এ চিহ্নযুক্ত স্থানে থামা যেতে পারে।

قف - অর্থ, এখানে থাম। চিহ্নটি এমন স্থানে ব্যবহৃত হয়, যেখানে তিলাওয়াতকারীর মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, বোধ হয় এখানে থামা যাবে না।

صلى - 'আল-ওয়াসলু আওলা' বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ পূর্বাপর দু'টি বাক্য মিলিয়ে পড়া ভাল।

---

৫১. আন-নশর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩১
৫২. আন-নশর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৩

صلى - 'কাদ ইউসালু' বাক্যের সংক্ষেপ। এর অর্থ কারো কারো মতে মিলিয়ে পড়া উত্তম এবং কারো কারো মতে থেমে যাওয়া ভাল।

وقف النبى صلى الله عليه وسلم - বাক্যটি এমন স্থানে লেখা হয়, যেখানে কোন কোন বর্ণনামতে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তিলাওয়াত করার সময় এখানে থেমেছিলেন।

আল-কুরআন মুদ্রণ

মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হওয়ার আগ পর্যন্ত আল-কুরআন হাতে লেখা হতো। যুগে যুগেই এমন একদল নিবেদিতপ্রাণ লোক ছিলেন, যাঁদের একমাত্র সাধনা ছিল আল-কুরআন লিপিবদ্ধ করা। আল-কুরআনের প্রতিটি অক্ষর সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করার লক্ষ্যে এ সাধক লিপিকারগণ যে অনন্য সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ইতিহাসে এর অন্য কোন নযীর নেই। কুরআনের সে লিপি সৌন্দর্যের ইতিহাস এতই দীর্ঘ যে, এজন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা যেতে পারে। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে হিজরী ১১১৩ সনে আল-কুরআন মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত সেই আল-কুরআনের একটি কপি মিসরের দারুল কুতুবে এখনো সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু মুসলিম-জাহানে সে সমস্ত মুদ্রিত কপি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে উসমান কর্তৃক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে আল-কুরআন মুদ্রিত হয়। প্রায় একই সময়ে কাযান শহর থেকেও একটি কপি মুদ্রিত হয়। ১৮২৮ খৃস্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথু মুদ্রণযন্ত্রে আল-কুরআনের আর একটি কপি মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে ছাপাখানার মাধ্যমে আল-কুরআনের কপি মুদ্রণের রেওয়াজ প্রচলিত হয়।[৫৩]

আল-কুরআনে উৎকীর্ণ নবী রাসূলগণ

মানব জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে অসংখ্য নবী রাসূল-প্রেরণ করেছেন। আল-কুরআনে এসব নবী-

---

৫৩. তারীখুল কুরআন, কুর্দি, পৃষ্ঠা ১৮৬, ডক্টর ছাবহী ছালেহ লিখিত গ্রন্থের গোলাম আহমদ হারিরী কৃত উর্দু তরজমা, পৃষ্ঠা ১৪২

রাসূলগণের মধ্য থেকে ২৫ জনের নাম প্রায় ৫১০ টি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। নিম্নে তাঁদের নাম পেশ করা হলো :

১. হযরত আদম (আ)।

পবিত্র কুরআনে ২৫ জায়গায় তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল-বাক্বারা	৩১,৩৩,৩৪,৩৫,৩৭,
২.	সূরা আলে-ইমরান	৩৩,৫৯
৩.	সূরা আল-মায়েদা	২৭
৪.	সূরা আল-আ'রাফ	১১,১৯,২৬,২৭,৩১,৩৫,১৭২
৫.	সূরা আল-ইসরা	৬১,৭০
৬.	সূরা আল-কাহফ	৫০
৭.	সূরা মারইয়াম	৫৮
৮	সূরা তা-হা	১১৫,১১৬,১১৭,১২০,১২১
৯.	সূরা ইয়া-সীন	৬০

২. হযরত নূহ (আ)।

আল-কুরআনে ৪৩ স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আন্ নিসা	১৬৩
২.	সূরা আল-আ'রাফ	৬৯,৫৯
৩.	সূরা আত-তাওবা	৭০
৪.	সূরা ইউনুস	৭১
৫.	সূরা হূদ	২৫, ৩২, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৮৯
৬.	সূরা ইবরাহীম	০৭
৭.	সূরা আল-ইসরা	০৩, ১৭
৮.	সূরা মারইয়াম	৫৮
৯.	সূরা আল-হাজ্জ	৪২
১০.	সূরা আল-ফুরকান	৩৭

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১১.	সূরা আশ্‌-শু'আরা	১০৫, ১০৬, ১১৬
১২.	সূরা আল-আহযাব	০৭
১৩.	সূরা আস্‌-সাফফাত	৭৫, ৭৯
১৪.	সূরা ছোয়াদ	১২
১৫.	সূরা গাফির	০৫, ৩১
১৬.	সূরা কাফ	১২
১৭.	সূরা আয্‌যারিয়াত	৪৬
১৮.	সূরা আন নাজম	৫২
১৯.	সূরা আল-কামার	০৭
২০.	সূরা আত্‌তাহরীম	১০
২১.	সূরা নূহ	২১, ২৬, ০১
২২.	সূরা আলে-ইমরান	৩৩
২৩.	সূরা আল-আনআম	৮৪
২৪.	সূরা আম্বিয়া	৭৬
২৫.	সূরা আল-মুমিনুন	২৩
২৬.	সূরা আল-আনকাবুত	১৪
২৭.	সূরা আশ-শূরা	১৩
২৮.	সূরা আল-হাদীদ	২৬

৩. হযরত ইদরীস (আ)।

আল-কুরআনে ২টি স্থানে হযরত ইদরীস (আ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা মারইয়াম	৫৬
২.	সূরা আশ্‌-শু'আরা	৬১

৪. হযরত ইবরাহীম (আ)।

আল-কুরআনে ৬৯ স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল-বাকারা	১২৪,১২৫,১২৫,১২৬,১২৭,১৩০,১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ২৫৮, ২৫৮, ২৫৮, ২৬০
২.	সূরা আলে ইমরান	৩৩, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৮৪, ৯৫, ৯৭
৩.	সূরা আন্ নিসা	৫৪, ১২৫, ১২৫, ১৬৩
৪.	সূরা আল-আন'আম	৭৪, ৭৫, ৮৩, ১৬১
৫.	সূরা আত-তাওবা	৭০, ১১৪, ১১৪
৬.	সূরা হূদ	৬৯, ৭৪, ৭৫, ৭৬
৭.	সূরা ইউসুফ	০৬, ৩৮
৮.	সূরা ইবরাহীম	৩৫
৯.	সূরা আল-হিজর	৫১
১০.	সূরা আন্ নাহল	১২০, ১২৩
১১.	সূরা মারইয়াম	৪১, ৪৬, ৫৮
১২.	সূরা আল-আম্বিয়া	৫১, ৬০, ৬২, ৬৯
১৩.	সূরা আল-হাজ্জ	২৬, ৪৩, ৭৮
১৪.	সূরা আশ্-শু'আরা	৬৯
১৫.	সূরা আল-আনকাবুত	১৬, ৩১
১৬.	সূরা আল-আহযাব	৩১
১৭.	সূরা আস্-সাফফাত	৭৩, ১০৪, ১০৯, ১৪০
১৮.	সূরা ছোয়াদ	৪৫
১৯.	সূরা আশ্ শূরা	১৩
২০.	সূরা আয-যুখরুফ	২৬
২১.	সূরা আয-যারিয়াত	২৪
২২.	সূরা আন-নাজম	৩৭
২৩.	সূরা আল-হাদীদ	২৬
২৪.	সূরা আল-মুমতাহিনা	৪, ৪

৫. হযরত ইসমাঈল (আ)।

আল-কুরআনে তাঁর নাম ১২ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল বাকারা	১২৫, ১২৭, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০
২.	সূরা আলে ইমরান	৭৪
৩.	সূরা আন নিসা	১৬৩
৪.	সূরা আল আন'আম	৭২
৫.	সূরা ইবরাহীম	৩৯
৬.	সূরা মারইয়াম	৫৪
৭.	সূরা আল-আম্বিয়া	৮৫
৮.	সূরা ছোয়াদ	৪৮

৬. হযরত ইসহাক (আ)।

আল-কুরআনে ১৭টি স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল বাকারা	১৩৩, ১৩৬, ১৪০
২.	সূরা আলে ইমরান	৮৪
৩.	সূরা আন নিসা	১৬৩
৪.	সূরা আল আন'আম	৮৪
৫.	সূরা হূদ	৭১
৬.	সূরা ইউসুফ	৬,৩৮
৭.	সূরা ইবরাহীম	৩৯
৮.	সূরা মারইয়াম	৪৯
৯.	সূরা আল-আম্বিয়া	৭২
১০.	সূরা আল আনকাবুত	২৭
১১.	সূরা আস-সাফ্ফাত	১১২,১১৩
১২.	সূরা ছোয়াদ	৪৫

৭. হযরত ইয়াকুব (আ)।

আল-কুরআনে ১৬ স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল বাকারা	১৩২,১৩৩, ১৩৬, ১৪০
২.	সূরা আলে ইমরান	৮৪
৩.	সূরা আন নিসা	১৬৩
৪.	সূরা আল আন'আম	৮৪
৫.	সূরা হূদ	৭১
৬.	সূরা ইউসুফ	৬, ৩৮, ৬৮
৭.	সূরা মারইয়াম	৬, ৪৯
৮.	সূরা আল-আম্বিয়া	৭২
৯.	সূরা আল আনকাবুত	২৭
১০.	সূরা ছোয়াদ	৪৫

৮. হযরত ইউসুফ (আ)।

আল-কুরআনে তাঁর নাম ২৬টি জায়গায় স্থান পেয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল আন'আম	৮৪
২.	সূরা ইউসুফ	৪,৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৭, ২১, ২৯, ৪৬, ৫১, ৫৬, ৫৮, ৬৯, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯০, ৯৪, ৯৯

৯. হযরত লুত (আ)।

আল-কুরআনে ২৭ টি স্থানে তাঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা হূদ	৭০, ৭৪, ৭৭, ৮১, ৮৯,
২.	সূরা আল-হিজর	৫৯, ৬১
৩.	সূরা আল-হাজ্জ	৪৩
৪.	সূরা আশ্-শুআরা	১৬০, ১৬১, ১৬৭

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
৫.	সূরা আন নামল	৫৪, ৫৬
৬.	সূরা আল আনকাবুত	২৬, ২৮, ৩২, ৩৩
৭.	সূরা ছোয়াদ	১৩
৮.	সূরা কাফ	১৩
৯.	সূরা আল কামার	৩৩,৩৪
১০.	সূরা আত্ তাহরীম	১০
১১.	সূরা আল আন'আম	৭৬
১২.	সূরা আল আ'রাফ	৮০
১৩.	সূরা আল আম্বিয়া	৭১, ৭৪
১৪.	সূরা আস-সাফফাত	১৩৩

১০. হযরত হূদ (আ)।

আল-কুরআনে ৭টি স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ রয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল-আ'রাফ	৬৫
২.	সূরা আশ্-শু'আরা	১২৪
৩.	সূরা হূদ	৫০, ৫৩, ৫৮, ৬০, ৮৯

১১. হযরত সালিহ (আ)।

আল-কুরআনে তাঁর নাম ১৩টি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল-আ'রাফ	৭৭,৭৩,৭৫,১৮৯,১৯০
২.	সূরা হূদ	৬২, ৮৯, ৬১, ৬৬
৩.	সূরা আশ্-শু'আরা	১৪২
৪.	সূরা আততাহরীম	০৪
৫.	সূরা আল-কাহফ	৮২
৬.	সূরা আন্ নামল	৪৫

১২. হযরত শুয়াইব (আ)।

আল-কুরআনে তাঁর নাম ১১টি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল-আ'রাফ	৮৮,৮৫,৯০, ৯২, ৯২
২.	সূরা হূদ	৮৭, ৯১, ৮৪, ৯৪
৩.	সূরা আশ্-শু'আরা	১৭৭
৪.	সূরা আল-আনকাবুত	৩৬

১৩. হযরত মূসা (আ)

আল-কুরআনে তাঁর নাম ১৩৬ জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল বাকারা	৫১,৫৩,৫৪,৫৫,৬০,৬১,৬৭,৮৭,৯২,১০৮, ১৩৬,২৪৬,২৪৮
২.	সূরা আলে-ইমরান	৮৪
৩.	সূরা আন-নিসা	১৫৩, ১৫৩, ১৬৪
৪.	সূরা আল মায়েদা	২০, ২২, ২৪
৫.	সূরা আল-আন'আম	৮৪, ৯১, ১৫৪
৬.	সূরা আল-আ'রাফ	১০৩,১০৪,১১৫,১১৭,১২২,১২৭,১২৮,১৩১, ১৩৪,১৩৮,১৪২,১৪২,১৪৩,১৪৩,১৪৪,১৪৮, ১৫০,১৫৪,১৫৫,১৫৯,১৬০
৭.	সূরা ইউনুস	৭৫,৭৭,৮০,৮১,৮৩,৮৪,৮৭,৮৮
৮.	সূরা হূদ	১৭, ৯৬. ১২০
৯.	সূরা ইবরাহীম	০৫,০৬,০৮
১০.	সূরা আল-ইসরা	০২, ১০১, ১০১
১১.	সূরা আল-কাহফ	৬০, ৬৬
১২.	সূরা মারইয়াম	৫১
১৩.	সূরা তা-হা	০৯,১১,১৭,১৯,৩৬,৪০,৪৯,৫৭,৬১,৬৫,৬৭, ৭০.৭৭.৮৩.৮৬.৮৮.৯১
১৪.	সূরা আল-আম্বিয়া	৪৮

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১৫.	সূরা আল-হাজ্জ	৪৪
১৬.	সূরা আল-মুমিনুন	৪৫, ৪৯
১৭.	সূরা আল-ফুরকান	৩৫
১৮.	সূরা আশ্-শু'আরা	২০. ৪৩.৪৫.৪৮.৫২.৬১.৬৩.৬৫
১৯.	সূরা আন নামল	০৭.০৯.১০
২০.	সূরা আল-কাছাছ	০৩.০৭.১০.১৫.১৮.১৯.২০.২৯.৩০.৩১.৩২. ৩৭.৩৮.৪৩.৪৪.৪৮.৪৮.৭৬.
২১.	সূরা আল-আনকাবুত	৩৯
২২.	সূরা আস-সাজদাহ্	২৩
২৩.	সূরা আল-আহ্যাব	০৭. ৬৯
২৪.	সূরা আসসাফফাত	১১৪.১২০
২৫.	সূরা গাফির	২৩.২৬.২৭.৩৭.৫৩
২৬.	সূরা হামীমুস সাজদাহ্	৪৫
২৭.	সূরা আশ্-শূরা	১৩
২৮.	সূরা আয-যুখরুফ	৪৬
২৯.	সূরা আল-আহ্কাফ	১২, ৩০
৩০.	সূরা আয-যারিয়াত	৩৮
৩১.	সূরা আন নাজম	৩৬
৩২.	সূরা আছ্-ছাফ	০৫
৩৩.	সূরা আন-নাযিয়াত	১৫
৩৪.	সূরা আল-আ'লা	১৯

১৪. হযরত যাকারিয়া (আ)।

আল-কুরআনে ৭টি স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আলে-ইমরান	৪৭. ৩৭. ৩৮
২.	সূরা আল-আন'আম	৮৫

৩.	সূরা মারইয়াম	০২. ০৭
৪.	সূরা আল-আম্বিয়া	৮৯

১৫. হযরত ইয়াহইয়া (আ)।

আল-কুরআনে ৩টি স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল-আনফাল	৪২
২.	সূরা তা-হা	৭৪
৩.	সূরা আল-আ'লা	১৩

১৬. হযরত হারুন (আ)।

আল-কুরআনে ২০ জায়গায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল বাকারা	২৪৮
২.	সূরা আন-নিসা	১৬৩
৩.	সূরা আল-আন'আম	৮৪
৪.	সূরা আল-আ'রাফ	১২২. ১৪২
৫.	সূরা ইউনুস	৭৫
৬.	সূরা মারইয়াম	২৮. ৫৩
৭.	সূরা তা-হা	৩০. ৭০. ৯০. ৯২
৮.	সূরা আল-আম্বিয়া	৪৮
৯.	সূরা আল-মুমিনুন	৪৫
১০.	সূরা আল-ফুরকান	৩৫
১১.	সূরা আশ্‌-শু'আরা	১৩. ৪৮
১২.	সূরা আল-কাছাছ	৩৪
১৩.	সূরা আছ্‌ ছাফফাত	১১৪. ১২০

১৭. হযরত দাউদ (আ)।

আল কুরআনে ১৬টি' স্থানে তাঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল-বাকারা	২৫১
২.	সূরা আন-নিসা	১৬৩
৩.	সূরা আল-মায়েদা	৭৮
৪.	সূরা আল-আন'আম	১৮৪
৫.	সূরা আল-ইসরা	৫৫
৬.	সূরা আল-আম্বিয়া	৭৮. ৭৯
৭.	সূরা আন-নামল	১৫. ১৬
৮.	সূরা সাবা	১০. ১৩
৯.	সূরা ছোয়াদ	১৭. ২২.২৪. ২৬. ৩০

১৮. হযরত সুলাইমান (আ)।

আল-কুরআনে ১৭টি স্থানে তাঁর নাম স্থান পেয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল-বাকারা	১০২. ১০২
২.	সূরা আন-নিসা	১৬৩
৩.	সূরা আল-আন'আম	৮৪
৪.	সূরা আল-আম্বিয়া	৭৮. ৭৯. ৮১
৫.	সূরা আন-নামল	১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ৩০. ৩৬. ৪৪.
৬.	সূরা সাবা	১২
৭.	সূরা ছোয়াদ	৩০. ৩৪

১৯. হযরত আইয়ুব (আ)।

আল-কুরআনে ৪টি স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আন-নিসা	১৬৩
২.	সূরা আল-আন'আম	৮৪

৩.	সূরা আল-আম্বিয়া	৮৪
৪.	সূরা ছোয়াদ	৪১

২০. হযরত যুলকিফ্ল (আ)।

আল-কুরআনে তাঁর নাম ২টি স্থানে উল্লেখ হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল-আম্বিয়া	৮৫
২.	সূরা ছোয়াদ	৪৮

২১. হযরত ইউনুস (আ)।

আল-কুরআনে তাঁর নাম ৪টি স্থানে উল্লেখ হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আন-নিসা	১৬৩
২.	সূরা আল-আন'আম	৮৬
৩.	সূরা ইউনুস	৯৮
৪.	সূরা আছ্ ছাফফাত	১৩৯

২২. হযরত ইলিয়াস (আ)।

আল-কুরআনে ২টি স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল-আন'আম	৮৫
২.	সূরা আছ্ ছাফফাত	১২৩

২৩. হযরত আল ইয়াসআ (আ)।

আল-কুরআনে তাঁর নামটি ১টি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা ছোয়াদ	৪৮

২৪. হযরত ঈসা (আ)।

আল-কুরআনে ২৫টি স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আল-বাকারা	৮৭. ১৩৬. ২৫৩
২.	সূরা আলে-ইমরান	৪৫.৫২.৫৫.৫৯.৮৪
৩.	সূরা আন-নিসা	১৫৮. ১৬৩. ১৭১
৪.	সূরা আল-মায়েদা	৪৬.৭৮.১১০.১১২.১১৪.১১৬
৫.	সূরা আল-আন'আম	৮৫
৬.	সূরা মারইয়াম	৩৪
৭.	সূরা আল আহযাব	০৭
৮.	সূরা আশ্‌-শু'আরা	১৩
৯.	সূরা আয-যুখরুফ	৬৩
১০.	সূরা আল-হাদীদ	২৭
১১.	সূরা আছ-ছাফ	০৬. ১৪

২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সা)।

আল-কুরআনে ৪টি স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত নং
১.	সূরা আলে-ইমরান	১৪৪
২.	সূরা আল-আহযাব	৪০
৩.	সূরা মুহাম্মাদ	০২
৪.	সূরা আল-ফাতহ	২৯

তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা

তাফসীর শব্দটি আল-কুরআনের সূরা আল-ফুরকানের ৩৩ নং আয়াত হতে গৃহীত। তাফসীর শব্দের অর্থ উদঘাটন করা, স্পষ্ট করা, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা, উন্মুক্ত করা, প্রকাশ করা, আবৃত বস্তু উন্মুক্ত করা বা খোলা ইত্যাদি। যে ব্যক্তি মূলনীতি পেশ করেন তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাও তাঁর কাজ। বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ লোকের মাধ্যমে কাজ করতে হয় তাঁকে। কেননা,

সব মানুষ একই ধরনের ব্যুৎপত্তি এবং যোগ্যতা-অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না।

বাক্য যখন উচ্চাঙ্গের হয়, আর তাতে অগণিত উদ্দেশ্যকে কিছু বাক্যের মাধ্যমে আদায় করা হয়, সে ক্ষেত্রে অবচেতন বস্তুর অবস্থার দর্পণ সামনে রেখে হুকুম-আহকামকে এ পন্থায় বর্ণনা করা যায়। বর্তমান আবশ্যকতাই যথেষ্ট নয়, ভবিষ্যতেও এর দ্বারা প্রয়োজন মাফিক গবেষণা ও উদ্ভাবন হতে পারে। বাক্যের মধ্যে তো রূপক, অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত সবই বিদ্যমান থাকে। এগুলো না হলে কিন্তু বাক্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অথবা প্রান্তসীমায় উপনীত না হয়ে মানুষের ধারণ ক্ষমতা অতিক্রম করে যায়। আল-কুরআন মাজীদে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য এমনভাবে একত্রিত হয়ে আছে, এজন্য বিশুদ্ধতা এবং অলংকারের দৃষ্টিতে কোন ধরনের পার্থক্য সংঘটিত হয়নি, বরং এতে করে বিষয়টি সোনায় সোহাগা রূপে নির্ণিত হয়েছে, সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

এজন্যই আল্লাহর কালামের বা বাক্যের তাফসীর এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা অত্যাবশ্যক। আল-কুরআন হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ। সেহেতু, এ গ্রন্থকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাদেরকে অনেক কিছুরই মুখাপেক্ষী হতে হয়। যেমন– আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য, অভিধান, হাদীস, ইতিহাস ও ভূগোল ইত্যাদি। আল-কুরআনের মধ্যে বীজের ন্যায় সবকিছুই বর্তমান রয়েছে। এ বীজ দ্বারা বৃক্ষ অংকুরিত করার সামর্থ্য এবং শক্তি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। আল-কুরআনে দু'ধরনের আয়াত রয়েছে :

এক. মুহকাম ও দুই. মুতাশাবিহ।

মুহকাম : আয়াতসমূহের মাধ্যমে শরী'আতের মূলনীতিগুলো এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে কারো কোন ধরনের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

মুতাশাবিহ্ : আয়াতসমূহের (যা একাধিক অর্থবোধক হতে পারে) মধ্যে জ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব ও তথ্য লুকায়িত রয়েছে। এসব আয়াতের মাধ্যমে বিশ্ববাসী কিয়ামাত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ.

হে রাসূল! তিনি আপনার ওপর গ্রন্থ নাযিল করেছেন, তন্মধ্যে কিছু আয়াত হচ্ছে মুহকামাত যেগুলো গ্রন্থের মূল বুনিয়াদ, আর কিছু হচ্ছে মুতাশাবিহাত।

মুহকাম অর্থ স্পষ্টবোধক, স্পষ্ট উপমা সম্বলিত। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে,

এগুলো গ্রন্থের মূল বা সুস্পষ্ট বর্ণনা। যেগুলোর অর্থ নির্ধারণ করার ব্যাপারে কোন প্রকার দ্ব্যর্থতা বা সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না। মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) আয়াত দু'ধরনের। এক ধরনের আয়াত যা বহু অর্থবোধক হতে পারে। এসব আয়াতের বেশির ভাগ সম্পর্ক হচ্ছে শাখা-প্রশাখার সাথে। এসব আয়াতের বিশ্লেষণে আপেক্ষিকতা থাকে। আরেক ধরনের আয়াত, যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে ঘোষিত হয়েছে :

وَمَايَعْلَم تَأْوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰهُ وَالرّٰسِخُوْنَ فِىْ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ

"অথচ তার আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি।"

কুরআন মানবজাতিকে জ্ঞানাহরণ করে সে অনুযায়ী আমল করে পূর্ণতায় পৌঁছার পথ-নির্দেশ করেছে। এছাড়া এটি এমন ভেদ ও অনুভূতির দ্বারা অবগুণ্ঠিত বিষয়াবলী সম্পর্কেও পথ দেখিয়েছে, যে ব্যাপারে না জ্ঞানের প্রবেশ আছে, না আছে বিজ্ঞানের। আল-কুরআন হচ্ছে অগণিত জ্ঞানের উৎস। এর মধ্যে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উন্নতির মূলনীতি রয়েছে। অনেক উচ্চমাপের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আল-কুরআনের ইবারতের মধ্যে বা পরতে পরতে লুকিয়ে আছে। এর মধ্যে সূক্ষ্মভাবে ফাসাহাত ও বালাগাতের তথা অলংকার শাস্ত্রের সমুদয় উপাদান ও বিষয়াবলী রয়েছে। সাথে সাথে মানব জীবনের চরিত্র-মাধুর্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ইবাদাত-বন্দেগী এবং পারস্পরিক লেন-দেন থেকে আরম্ভ করে সব ধরনের শিক্ষাও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে এর মধ্যে। আল-কুরআনের বাচনভঙ্গি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, দলীল-প্রমাণ উদ্দিষ্ট বিষয়ে এতই সহজ-সরল এবং প্রাঞ্জল, যা কোন মস্তবড় বিজ্ঞানী ও নিদেন মূর্খ উভয়েই বুঝতে সক্ষম। প্রত্যেকেই স্ব স্ব জ্ঞানাহরণ এবং স্বাদ আস্বাদন করে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

এতে হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে এমন সহজ ও দৃষ্টিগ্রাহ্য পথ অবলম্বন করা হয়েছে, যদ্দারা সহজেই মানুষের অন্তরে রেখাপাত করে এবং তারা বাস্তবক্ষেত্রে আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে যায়। কোথাও কোথাও স্বীয় সত্তা এবং গুণাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে করে আল্লাহর মাহাত্ম্য মানুষকে কঠিনকার্য সম্পাদন করার জন্যও উদ্বুদ্ধ করে। আবার কোথাও আখিরাত এবং পুনরুত্থানের সাথে সঙ্গতি রেখেই আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ কৃতকর্মের ফল বা কর্মফলের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। কোথাও অতীতের

জাতিগুলোর অবস্থা বর্ণনা করে শিক্ষা গ্রহণ করার এবং নাফরমানি থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। আল-কুরআন এভাবে উন্মোচন করার জন্য মুফাসসির বা কুরআনের ভাষ্যকারের আরবী ব্যাকরণ, ফিক্হ, উসূলূল ফিক্হ, হাদীস, উসূলুল হাদীস, ইল্ম কিরাআত, ইলম কালাম, ইল্ম তারীখ, ভূগোলের জ্ঞান, রিজাল শাস্ত্র বা জীবন চরিত, অভিধান ইত্যাদির জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে উম্মাতের আইম্মায়ে কিরাম আল-কুরআনের তাফসীর সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। কেননা প্রত্যেক মানুষ এ ধরনের সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হবে– এটা আশা করা যায় না। শাখা-প্রশাখার কোন সীমা নেই। সব সময় নিত্য-নতুন আবশ্যকীয় বিষয়াবলী উদ্ভূত হতে থাকে। সময়ের বির্বতন ঘটতে থাকে। নিত্য-নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হচ্ছে, এ ধরনের কোন গ্রন্থ নেই যা সাধারণ শাখা-প্রশাখাকে পরিবেশনকারী। তাই আবশ্যক, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, সময়ের প্রখ্যাত আলিমগণ হাদীস, ফিক্হ ও তাফসীরের খিদমতে আত্মনিয়োগ করবেন এবং আল-কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবেন। এতে করে আল্লাহ এবং রাসূল (সা)-এর আহকাম বা বিধান মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে। আর উদ্ভূত বিষয়াবলী সহজভাবে সমাধাও করা যাবে। বাচনভঙ্গির নিরিখে ইল্মুল কিরাআত, শব্দসমূহের অর্থের নিরিখে অভিধান, শব্দসমূহের ইফরাদী ও তারকীবী বা শাব্দিক ও বাক্যের আহকামের নিরিখে ব্যাকরণ এবং অবস্থার ব্যাখ্যার নিরিখে হাকীকী বা বাস্তব ও রূপক দলীল-প্রমাণ, পরিপূর্ণতার নিরিখে নাসিখ-মানসূখ, ইত্যাদি বিশ্লেষণই হচ্ছে ইল্মে তাফসীরের সূচনা।[৫৪]

তাফসীর এর সংজ্ঞা

তাফসীর শব্দের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষী একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. আবু হাইয়ান (র) বলেন,

إنه (التفسير) علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القران ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذاته

৫৪. তাফসীর সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১-৩

তাফসীর এমন বিদ্যাকে বলা হয় যার মধ্যে গবেষণা করা হয় আল-কুরআনের শব্দাবলী, অর্থসমূহ, একক ও যৌগিক বিধি-বিধান এবং এমন সব কারণ যার ওপর নির্ভর করে বিষয়টি সংঘটিত হয়েছে।

২. আল্লামা বাগভী (র) বলেন,

هوالعلم الـذى يعـرفّ بـه فـهم القـران الكريـم وإدراك معانيـه والكشـف عـن مقاصده ومراميه واستخراج احكامه وحكمه وتوضيح معنى الايات القرانية.

তাফসীর হচ্ছে এমন একটি বিদ্যা যার মাধ্যমে আল-কুরআন বুঝা, অর্থসমূহ উপলব্ধি করা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্টভাবে উপস্থাপন, হুকুম-আহকাম বের করার নিয়ম-নীতি এবং আয়াতসমূহের সুস্পষ্ট অর্থ জানা যায়।

৩. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন,

هو علم يبحث عن اصول كلام الله من حيث الدلالة على المراد.

তাফসীর এমন একটি জ্ঞান যেখানে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর নির্দেশনামূলক আল্লাহর কালামের মৌলিক নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৪. আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন, هو علم يبحث فيه عن معنى نظم القـران بحسب الطاقة البشرية وبحسب مايقتضى القواعد العربية

তাফসীর এমন এক বিদ্যার নাম যাতে মানুষের সাধ্যানুযায়ী এবং আরবী ভাষার নিয়মাবলীর চাহিদা মুতাবিক আল-কুরআনের শব্দার্থ ও ভাবার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৫. আয-যারকানী (র) বলেন,

هو علم يبحث فيه عن القران الكريم من حيث دلالتـه علـى مـراد الله تعـالى بقدر الطاقة البشرية.

তাফসীর এমন এক বিদ্যার নাম যাতে মানুষের সাধ্যানুযায়ী পবিত্র আল-কুরআনের কোন আয়াত বা কোন শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কী উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

আরবী ভাষায় 'তাফসীর' শব্দটির পাশাপাশি "তা'বীল" শব্দটিও ব্যবহৃত হয়, تـاويل শব্দটি باب تفعيل এর মাছদার বা ক্রিয়ামূল اول শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা, প্রাধান্য দেয়া, ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি। 'তা'বীল'-এর সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রেও একাধিক মত পাওয়া যায়। যেমন–

১. আল্লামা মাতুরাদী (র) বলেন, التاويل هو الترجيح لأحد المحتملات بدون قطع তা'বীল হলো কোন শব্দ বা বাক্যের সম্ভাব্য কতগুলো অর্থ থেকে কোন একটাকে অনিশ্চিতভাবে প্রাধান্য দেওয়া।

২. আল্লামা আয-যারকানী (র) বলেন, التأويل بيان عن طريق الدراية তা'বীল হল শব্দের অর্থকে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বর্ণনা করা।

৩. আল্লামা যুরজানী (র) বলেন,

التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله اذاكان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة.

তা'বীল হলো শব্দকে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে সম্ভাব্য অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যে সম্ভাব্য অর্থটি আল-কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল।

৪. পরবর্তী যুগের উলামায়ে কিরাম বলেন, তা'বীল হলো, শব্দকে তার প্রসিদ্ধ অর্থ থেকে অখ্যাত অর্থের দিকে ফেরানো বিশেষ কোন দলীলের মাধ্যমে।

তাফসীর ও তা'বীলের পার্থক্য

ক্রম	তাফসীর	তা'বীল
১	التفسير অর্থ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা, স্পষ্ট করা।	التاويل অর্থ প্রাধান্য দেয়া, সম্ভাব্য একটি অর্থ স্থির করা।
২	তাফসীর অকাট্য। ফলে তা আমল ও বিশ্বাস উভয়কে ওয়াজিব করে।	তা'বীল অকাট্য নয়। ফলে তা শুধু আমলকে ওয়াজিব করে।
৩	التفسير بيان لفظ لايحتمل الا وجها واحدا তাফসীর শব্দ মাত্র একটি মুখ্য উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা রাখে।	التاويل لفظ متوجه الى معان مختلفة منها واحدا بما ظهر له من الادلة তা'বীল সম্ভাব্য অনেক অর্থ থেকে দলীল দ্বারা একটি অর্থ নির্দিষ্ট করে।
৪	ইমাম রাগিব (র) বলেন- التفسير اعم من التاويل واكثر استعماله فى الالفاظ ومفرداتها তাফসীর শব্দটি ব্যাপক, এটি অধিক ব্যবহৃত হয় শব্দে ও এককে।	اكثر استعمال التاويل فى المعانى والجمل তা'বীলের অধিক ব্যবহার অর্থে ও বাক্যে।

ক্রম	তাফসীর	তা'বীল
৫	ইমাম মাতুরিদী (র) বলেন– التفسير القطع بان المراد من اللفظ هذا– তাফসীর হলো নিশ্চিতভাবে একথা বলা যে, এ শব্দের মর্ম এটাই।	التاويل ترجيح احد المحتملات بدون القطع অনিশ্চিতভাবে বিভিন্ন সম্ভাবনা থেকে একটিকে প্রাধান্য দেয়ার নাম তা'বীল।
৬	التفسير ما يتعلق بالرواية তাফসীর রিওয়ায়াতের সাথে সম্পৃক্ত।	التاويل ما يتعلق بالدراية তা'বীল বিবেক-বিবেচনার সাথে সম্পৃক্ত।
৭	তাফসীরের মধ্যে رای -এর কোন দখল নেই।	তা'বীলের মধ্যে رای -এর দখল রয়েছে।
৮	আবূ তালিব সা'লাবী (র) বলেন– শব্দের বাস্তব বা রূপক অর্থ বর্ণনা করাকে তাফসীর বলে।	শব্দের লুক্কায়িত ভাব বর্ণনা করাকে তা'বীল বলে।
৯	ইমাম বাগভী (র) বলেন– تاريخ، شان نزول, اثار وسنه ইত্যাদির আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করাকে তাফসীর বলে।	ইজতিহাদের আলোকে সম্ভাব্য অর্থে আয়াতের ব্যাখ্যা করাকে তা'বীল বলে।
১০	মুতাআখখিরীন বা পরবর্তী যুগের আলিমগণ বলেন– তাফসীর হলো আল-কুরআনের এমন অর্থ বর্ণনা করা যা ইবারত দ্বারা বোধগম্য হয়।	তা'বীল হলো এমন অর্থ বর্ণনা করা যা ইশারা দ্বারা বোধগম্য হয়।

ইল্‌মুত্ তাফসীর

পরিভাষায় ইল্‌মুত্ তাফসীর বলতে সেই ইলমকে বুঝায়, যার মধ্যে আল-কুরআনের আয়াতের অর্থসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণনা করা হয় এবং আল-কুরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত সকল জ্ঞাতব্য বিষয় ও জ্ঞান-রহস্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়।

ইল্‌মুত্ তাফসীরের বিষয় বস্তু

তাফসীর পরিভাষাটি আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ব্যবহৃত। সুতরাং ইল্‌মুত্ তাফসীরের প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত আল-কুরআন।

ইল্‌মুত্‌ তাফসীর এর উদ্দেশ্য

ইলমুত্‌ তাফসীরের উদ্দেশ্য প্রকৃত ও স্থায়ী কল্যাণ অর্জন করা এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা।

ইল্‌মুত্‌ তাফসীরের মর্যাদা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা সম্বলিত শাস্ত্রকে ইল্‌মুত্‌ তাফসীর বলা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ইলম বা শাস্ত্র। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইলম নেই। কেননা আল-কুরআন হচ্ছে সর্বময় জ্ঞানের উৎস, পার্থিব ও ইহকালীন উন্নতি নির্ভর করে এ বিধি-বিধানের উপর। ইলমুত্‌ তাফসীরে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে আলোচনা করা হয়। সুতরাং এ বিদ্যার মর্যাদা অপরিসীম। আল-কুরআনের গবেষণার মর্যাদা স্বয়ং আল-কুরআন ও রাসূল (সা)-এর হাদীসে যুক্তি সহকারে আলোচিত হয়েছে।[৫৫]

ইলমুত্‌ তাফসীর এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ.

"আমি আপনার নিকট উপদেশ গ্রন্থ, (আল-কুরআন) এজন্যই অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষের সামনে তাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ বাণীসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন।"

আল-কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ ايَاتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি এটা বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদের (অন্তরকে নাফরমানীর পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্র করেন, তিনি তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়সমূহ শিক্ষা দেন।"

---

৫৫. আল-কুরআনুল কারীম ওয়া দাস্‌তুরুল আলম, পৃষ্ঠা-১৫৬, ১৫৭

মহানবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে শুধু আল-কুরআনের শব্দই শিক্ষা দিতেন না, এর পুরো তাফসীরও বর্ণনা করতেন। এ কারণেই প্রথম যুগের মুসলিমদের এক একটি সূরা পড়তে কোন কোন সময় কয়েক বছর সময় লেগে যেত।

রাসূল (সা) এর যুগ

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৎ ও সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় কোন আয়াতের তাফসীর অবগত হওয়া সমস্যা ছিল না। কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে যখনই কোন জটিলতা দেখা দিত, সাহাবায়ে কিরাম মহানবী (সা)-এর শরণাপন্ন হতেন। তাঁর কাছ থেকে তাঁরা সন্তোষজনক জবাব পেয়ে যেতেন।

এভাবে মহানবী (সা) সাহাবীদের কাছে পবিত্র কুরআন মাজীদের নানা বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতেন। সাহাবায়ে কিরাম মনোযোগ দিয়ে প্রিয়নবী (সা)-এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা শ্রবণ করতেন। সাহাবায়ে কিরামের নিকট পবিত্র কুরআন মাজীদের কোন আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য মনে হলে মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে তা জেনে নিতেন। যেমন সূরা আল আন'আমের ৮২ নং আয়াতে "যুলম" শব্দের ব্যাখ্যা জানার জন্য রাসূল (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, এর অর্থ হচ্ছে শিরক। এভাবে মহানবী (সা)-এর যুগে তাফসীর শাস্ত্রের অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়।

সাহাবায়ে কিরামের যুগ

সাহাবায়ে কিরাম সকলেই পবিত্র কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারতেন। তবে আল-কুরআনের মর্মার্থ ও তাফসীর বুঝার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে তারতম্য ছিল। যেমন ইব্‌ন কুতাইবা বলেন–

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাফসীর শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন চার খলীফা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌নুল আব্বাস (রা), উবাই ইব্‌ন কা'ব, যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা), আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌নুয যুবাইর (রা)।

তাঁদের পরবর্তী তাফসীর শাস্ত্রে পারদর্শী সাহাবীগণ হলেন– আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), আবু হুরাইরা (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা), জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা), আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা), আয়িশা (রা) প্রমুখ।

খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আলী (রা) থেকে সর্বাধিক তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে বেশি তাফসীর বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ ইব্নুল আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা), উবাই ইব্নুল কা'ব (রা) প্রমুখ থেকে।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাফসীর শাস্ত্রের অগ্রগতির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা)। তাঁকে আল-কুরআনের ভাষ্যকার বলা হয়। মহানবী (সা) তাঁর জন্যে দু'আ করেছিলেন- اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاْوِيْلَ

সাহাবায়ে কিরাম চারটি ভিত্তিতে আল-কুরআনের তাফসীর করতেন। যেমন-

১। আল-কুরআন।

অর্থাৎ আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর করতেন।

২। আল হাদীস।

মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করে এবং তাঁর অবর্তমানে তার বাণী তথা হাদীস দ্বারা তাফসীর করতেন।

৩। ইজতিহাদ।

সাহাবায়ে কিরাম পবিত্র কুরআন মাজীদে ও হাদীসে কোন আয়াতের ব্যাখ্যা না পেলে ইজতিহাদের মাধ্যমে আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন।

৪। আহলে কিতাবের মাধ্যমে।

কুরআন মাজীদের বাণী পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের বাণীর ন্যায়। বিশেষ করে নবীদের কাহিনী, পূর্ববর্তী উম্মাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা ইত্যাদি। সুতরাং আল-কুরআনের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা সাহাবায়ে কিরাম আহলে কিতাবের মাধ্যমে জেনে নিতেন।

সাহাবায়ে কিরামের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তাফসীর শাস্ত্র বিশেষভাবে উৎকর্ষ ও অগ্রগতি লাভ করে।

তাবে'ঈদের যুগ

তাবে'ঈগণের যুগকে তাফসীর শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় যুগ বলে অভিহিত করা হয়। তাফসীর শাস্ত্রে সুদক্ষ সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন স্থানে তাফসীরের দারস প্রদান করার পর তাবে'ঈদের একটি দল তাফসীর সম্পর্কীয় জ্ঞানে দক্ষ হয়ে উঠেন।

আবদুল্লাহ ইব্নুল আব্বাস (রা) মক্কায় মাদরাসা স্থাপন করে সেখান থেকে তাফসীরের দারস দেয়া শুরু করেন। মক্কায় আবদুল্লাহ ইব্নুল আব্বাস (রা) এর কাছে যাঁরা তাফসীর শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ, ইকরামা, তাউস ইব্ন কাইছান, আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রা) প্রমুখ।

মদীনায় তাফসীরের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন উবাই ইব্ন কা'ব (রা)। যে সকল তাবে'ঈ মদীনায় তাঁর কাছে তাফসীর শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন তাঁরা হচ্ছেন যায়িদ ইব্ন আসলাম, আবুল আলিয়া, মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রা) প্রমুখ।

ইরাকে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) তাফসীরের পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। যেসব তাবে'ঈ ইরাকে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর নিকট তাফসীর শাস্ত্র শিক্ষা করেন তাঁরা হচ্ছেন– আলকামা ইব্ন কাইস, মাসরুক, আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ, আমর শা'বী, হাসান বসরী, কাতাদাহ ইব্ন দায়ামা আস-সাদুসী (র) প্রমুখ। অসংখ্য তাবে'ঈ নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভা বলে তাফসীর শাস্ত্রে যথেষ্ট উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করেছেন।[৫৬]

মহানবী (সা) এর যুগে তাফসীর শাস্ত্রের উৎকর্ষ ও অগ্রগতির যে ধারা শুরু হয় তা ক্রমান্বয়ে সাহাবী ও তাবে'ঈদের যুগে এসে পূর্ণতা লাভ করে। তাফসীর শাস্ত্রের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে সাহাবী ও তাবে'ঈদের অবদান অনস্বীকার্য।

তাবে'ঈগণের পরবর্তী যুগ

বানু উমাইয়া যুগের শেষে আব্বাসীয় যুগের শুরু থেকে তাফসীর গ্রন্থাবদ্ধকরণ শুরু হয়। ড. হুসাইন আযযাহাবী তাফসীরশাস্ত্রকে নিম্নোক্ত কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করেন।

প্রথম স্তর : রিওয়ায়াতের মাধ্যমে তাফসীর চর্চা

তাফসীর গ্রন্থাবদ্ধকরণের পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম রাসূলে করীম (সা) এর কাছ থেকে বর্ণনা করতেন। তাঁদের পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে এবং তাবে'ঈগণ সাহাবীদের কাছ থেকে কিংবা একে অপরের কাছ থেকে বর্ণনা শুনার মধ্যেই তাফসীর চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল।

---

৫৬. তারীখু ইলমিত তাফসীর, পৃষ্ঠা-৬৫

দ্বিতীয় স্তর : হাদীস সংকলনের সাথে তাফসীরের সংকলন

হাদীস সংকলন শুরু হওয়ার পর হাদীসের সাথে তাফসীরও সংকলন হতে থাকে। তবে সে সময় তাফসীর পৃথক কোন গ্রন্থাকারে ছিল না। হাদীসের সাথেই তাফসীর লিখিত ছিল। একেক সূরা বা আয়াতের তাফসীর একেক স্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। ইয়াজীদ ইব্‌ন হারুন সালমী (মৃত্যু-১১৭ হিজরী), ওয়াকী ইব্‌ন জাররাহ (মৃত্যু-১৯৭ হিজরী), সুফইয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (মৃত্যু-১৯৮ হিজরী), আবদুর রাজ্জাক ইব্‌ন হুমাম (মৃত্যু-২২১ হিজরী), আদম ইব্‌ন আবি আয়াস (মৃত্যু-২২০ হিজরী), আবদ ইব্‌ন হামদি (মৃত্যু-২৪৯ হিজরী), প্রমুখ অনেক কষ্ট করে বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে রাসূল (সা) এর হাদীস সংকলন করেছেন। আর সে সকল হাদীসের সাথে তাফসীরও সংকলিত হয়। তখন হাদীস ও তাফসীর এক সাথেই ছিল।

তৃতীয় স্তর : হাদীস থেকে তাফসীর পৃথকীকরণ

হাদীস ও তাফসীর সংক্রান্ত হাদীস এক সাথে থাকায় পাঠকদের সমস্যা হয়। ফলে হাদীস ও তাফসীর পৃথক করার পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং কুরআনের মাসহাফ অনুযায়ী তাফসীর লেখার কাজ শুরু হয়। এক্ষেত্রে ইব্‌ন মাজাহ (মৃত্যু-২২৭ হিজরী), ইব্‌ন জারীর আত্ তাবারী (মৃত্যু-৩১০ হিজরী), আবু বাকর মুনযির নিশাপুরী (মৃত্যু-৩১৮ হিজরী), ইব্‌ন আবি হাতিম (মৃত্যু-৩২৭ হিজরী), প্রমুখ ব্যক্তিগণ গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁদের সংকলিত তাফসীর গ্রন্থে রাসুল (সা) এর হাদীস, সাহাবা ও তাবে'ঈদের বক্তব্যের বাইরে কিছু ছিল না। তবে তাফসীরে তাবারীতে একাধিক মতের মধ্যে কোন্‌টি অধিক গ্রহণযোগ্য তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম কে মাসহাফের তারতীব অনুযায়ী আল-কুরআনের তাফসীর গ্রন্থাবদ্ধ করেন এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। কেউ কেউ মনে করেন ফাররা (মৃত্যু-২০৭ হিজরী), সর্বপ্রথম আল-কুরআনের মাসহাফ অনুযায়ী তাফসীর গ্রন্থাবদ্ধ করেন। কেউ কেউ বলেন, হিজরী প্রথম শতকে তাফসীর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হলেও হযরত ইব্‌নুল আব্বাস (রা) থেকে মুজাহিদ (র) পুরো তাফসীর জেনে নেন এবং লিখে রাখেন। এ হিসেবে ইব্‌নুল আব্বাস (রা)-ই প্রথম মুফাসসির, যিনি সম্পূর্ণ কুরআন শরীফের তাফসীর মুজাহিদ (র)-এর নিকট বর্ণনা করেন; যদিও তা গ্রন্থাকারে ছিল না।

কেউ কেউ বলেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান (মৃত্যু-৮৬ হিজরী), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরকে কুরআনের তাফসীর লেখার কাজে নিয়োগ করেন এবং তিনি তা

সম্পন্ন করেন। তিনি ৯৪ মতান্তরে ৯৫ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম যাঁরা তাফসীর সংকলন করেছেন তিনি তাঁদের একজন। কেউ কেউ বলেন, আমর ইব্ন আবিদ (মু'তাজিলাদের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি), হযরত হাসান বসরী (মৃত্যু-১১৬ হিজরী) থেকে শুনে শুনে একটি তাফসীর গ্রন্থ লিখেন। কারো কারো মতে, ইব্ন জারীর (মৃত্যু-১৫০ হিজরী), তিন খণ্ডে বিভক্ত তাফসীর লিখেন।

চতুর্থ স্তর : মনগড়া তাফসীরের সূচনা

এ স্তরের তাফসীরও হাদীস-নির্ভর ছিল। তবে আগের মত সনদ উল্লেখ করা হত না। সনদ উল্লেখ থাকলেও হাদীস ছিল সংক্ষিপ্ত। যার কারণে এ পর্যায়ে তাফসীরে মুফাসসিরগণের মনগড়া উক্তি সাহাবী কিংবা তাবে'ঈদের বক্তব্যের সাথে সন্নিবেশিত হতে থাকে। এ স্তরের তাফসীরে ইসরাইলী বর্ণনা ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন দলের মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সাধনে তাফসীর ব্যবহৃত হয়। যেমন সূরা আল ফাতিহার 'মাগদূব ও দাল্লিন' শব্দের তাফসীরে রাসূলে করীম (সা), সাহাবী ও তাবে'ঈদের বর্ণনায় ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন কোন মুফাসসিরের বর্ণনায় এ দু'টি শব্দের তাফসীরে দশটি অভিমত বিদ্যমান।

পঞ্চম স্তর : তাফসীরে যুক্তি ও দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ের অনুপ্রবেশ

ইতোপূর্বে তাফসীর করার ক্ষেত্রে রাসূল (সা)-এর বাণী, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'ঈদের বক্তব্যের উপর নির্ভর করা হত। কিন্তু যখন অনারবদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং মুসলিমরা নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিতি লাভ করে, তদুপরি তাদেরকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তখন তাফসীরে ইল্মে কালাম বা দর্শনশাস্ত্রের প্রবেশ ঘটে।

তাসাউফ, ইতিহাস, নাহু, ছরফ, ফিক্হসহ বিভিন্ন বিষয় তাফসীরের সাথে সম্পৃক্ত হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে তাফসীর লেখা শুরু হয়, যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। যুগ সমস্যা সমাধানে তাফসীরকারগণ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা পেশ করেন। এভাবে তাফসীরের ক্ষেত্রে নকলী দলীল তথা হাদীসের উপর আকলী দলীল তথা যুক্তির প্রাধান্য দেখা যায়। এ সময় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে তাফসীর চর্চা শুরু হয়, যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।[৫৭]

---

৫৭. আবদু-দ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ, সাইয়েদ কুতুব, জীবন ও কর্ম, পৃষ্ঠা-১৯৮-২০০

ইল্‌মুত্‌ তাফসীর-এর মূল উৎস

একথা সত্য যে, আল-কুরআনের তাফসীর প্রথমতঃ স্বয়ং আল-কুরআন দ্বারা, অতঃপর হাদীস দ্বারা করা উচিত। মুসলিম জাতি কিভাবে 'ইল্‌মুত্‌ তাফসীর' সংরক্ষণ করল, এ ক্ষেত্রে তাদের কী পরিমাণ শ্রম-মেহনত ব্যয়িত হয়েছে এবং চেষ্টা-সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে, তার এক চিত্তাকর্ষক ইতিহাস রয়েছে। সে ইতিহাস বর্ণনার অবকাশ এখানে কম। তবে কুরআনের তাফসীরের উৎসগুলো কী কী, 'ইল্‌মে-তাফসীর' সম্পর্কে প্রতিটি ভাষায় যে অগণিত গ্রন্থ রয়েছে, ঐগুলোর লেখকগণ কুরআন শরীফের ব্যাখ্যায় কোন্‌ কোন্‌ উৎস থেকে সাহায্য নিয়েছেন, এখানে সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলো কিছুটা বর্ণনা করা হল।[৫৮]

১। **আল-কুরআন :** ইল্‌মুত্‌ তাফসীর-এর প্রথম উৎস হচ্ছে আল-কুরআন। আল-কুরআনে এ ধরনের এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোন আয়াতে হয়তো কোন কথা অস্পষ্ট বা সংক্ষেপে বলা হয়েছে যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কিন্তু অপর আয়াতে উক্ত আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, সূরা আল ফাতিহার দু'আ সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, صِراطَ الَّذِيْنَ أنعَمتَ عَلَيهِم। "আমাদেরকে ঐ সব লোকের রাস্তা দেখাও, যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ।" কিন্তু এখানে এটা সুস্পষ্ট নয় যে, ঐ সব লোক কারা, যাদের আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন। তাই অপর এক আয়াতে সেসব ব্যক্তিকে এইভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে ঃ

أُولَئِكَ الَّذِيْنَ أَنعم الله عليهِم مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ.

"তারাই হচ্ছে সেই সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ নি'আমাত দান করেছেন, তারা বিভিন্ন নবী-রাসূল, সিদ্দীকীন, শহীদ ও সৎ কর্মশীল।"

মুফাসসিরগণ কোন আয়াতের তাফসীর করার সময় সর্বপ্রথম এটা লক্ষ্য করেন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা স্বয়ং আল-কুরআনের অপর কোন আয়াতে রয়েছে কিনা। যদি থাকে তাহলে ব্যাখ্যা হিসাবে ঐ আয়াতকেই গ্রহণ করে থাকেন। যদি আল-কুরআনে সে আয়াতের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়, তবেই অন্যান্য উৎসের মধ্যে ব্যাখ্যা তালাশ করা বিধেয়।

২। **আল-হাদীস :** মহানবী (সা)-এর বক্তব্য, কার্যাবলী এবং অনুমোদনকে 'হাদীস' বলা হয়। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের

---

৫৮. গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা-১৩৮-১৩

বাহকরূপে তাঁকে এজন্যই প্রেরণ করেছেন যে, তিনি মানব জাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরবেন। কাজেই আল্লাহর রাসূল নিজের কথা ও কাজ দ্বারা এ মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুপরিকল্পিতভাবে পালন করেছেন। বস্তুতঃ মহানবী (সা)-এর গোটা জীবনই ছিল পবিত্র কুরআনের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। এজন্য মুফাসসিরগণ আল-কুরআন অনুধাবনের জন্য দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসের প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকেই আল্লাহর কিতাবের অর্থ নির্ধারণ করেছেন। অবশ্য হাদীসের মধ্যে 'সহীহ', 'য'ঈফ' ও 'মওযু' প্রভৃতি ধরনের বর্ণনা আছে বলে সত্যানুসন্ধানী মুফাসসিরগণ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতার পরীক্ষা নির্ধারিত মূলনীতির মানদণ্ডে হতো। কাজেই কোথাও কোন হাদীস পেয়েই বাছ-বিচার ব্যতিরেকে তার আলোকে আল-কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা স্থির করে ফেলা বৈধ নয়। কারণ, হতে পারে উক্ত হাদীসের প্রমাণ-সূত্র দুর্বল এবং অপর প্রামাণ্য হাদীসের পরিপন্থী। আসলে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক।

৩। **সাহাবীগণের বক্তব্য :** সাহাবায়ে কিরাম মহানবী (সা) থেকে সরাসরি আল-কুরআনের শিক্ষা লাভ করেছেন। এ ছাড়া ওহী নাযিলের যুগে তাঁরা জীবিত ছিলেন। আল-কুরআন নাযিলের গোটা পরিবেশ ও পটভূমি প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের সামনে ছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসীরের বেলায় তাঁদের বক্তব্য যত প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য হবে, পরবর্তী লোকদের কিছুতেই সে মর্যাদা থাকার কথা নয়। অতএব, যেসব আয়াতের ব্যাখ্যা আল-কুরআন বা হাদীস থেকে জানা যায় না, সেক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যই হচ্ছে সবচাইতে বেশি গুরুত্বের অধিকারী। কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবীগণ ঐকমত্যে পৌছুলে মুফাসসিরগণ তাঁদের সে সর্বসম্মত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া সেক্ষেত্রে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা দান বৈধও নয়। তবে, কোনো আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদি সাহাবীগণের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রে পরবর্তী তাফসীরকারগণ অন্য প্রমাণাদির আলোকে এটা পরীক্ষা করে দেখতেন যে, ঐগুলোর মধ্যে কোন্ মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায়। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই বহু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে। রচিত হয়েছে 'উছূলুল-ফিকহ', 'উছূলুল-হাদীস' ও 'ইল্মুত্ তাফসীর।'

৪। **তাবে'ঈদের বক্তব্য :** এ ব্যাপারে সাহাবীগণের পরবর্তী মর্যাদা হলো তাবে'ঈদের। যেসব মহৎ ব্যক্তি সাহাবীগণের মুখ থেকে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা

শোনার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদেরকেই 'তাবে'ঈ' বলা হয়। এ কারণে তাবে'ঈগণের বক্তব্যও তাফসীর শাস্ত্রে বিরাট গুরুত্বের অধিকারী। অবশ্য তাবে'ঈগণের বক্তব্য তাফসীরের ক্ষেত্রে দলীল কি না এ নিয়ে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তাফসীরের ক্ষেত্রে তাবে'ঈগণের বক্তব্যের গুরুত্ব যে অত্যন্ত বেশি, সে ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেননি।

৫। আরবী সাহিত্য : আল-কুরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ, সেহেতু আল-কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উক্ত ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা একান্ত জরুরী। আল-কুরআনে এমন বহু আয়াত আছে যেগুলোতে শানে-নুযূল কিংবা অপর কোন ফিক্‌হী বা বিশ্বাস সংক্রান্ত কোন জটিলতা থাকে না। সেগুলোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) কিংবা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'ঈগণের বক্তব্যও না থাকায় একমাত্র আরবী সাহিত্যের ভাবধারা অবলম্বন করেই ঐ সব আয়াতের তাফসীর করা হয়। এ ছাড়া কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় যদি কোন প্রকার মতবৈষম্য থাকে, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য মত নির্ধারণের বেলায়ও আরবী সাহিত্য থেকে সাহায্য নিতে হয়।

৬। চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবন : তাফসীরের সর্বশেষ উৎস হলো চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবন শক্তি। আল-কুরআনের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ও তাৎপর্য এমন একটি অকূল সমুদ্র, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইসলামের জ্ঞান-সমঝ প্রদান করেছেন, তিনি তাতে যতই চিন্তা-গবেষণা করবেন, ততই নিত্য নতুন রহস্যাবলী তাঁর সামনে উদঘাটিত হতে থাকবে। তাফসীরকারগণ নিজ নিজ উদ্ভাবনী প্রতিভা ও গবেষণার ফলাফল নিজেদের তাফসীরসমূহে বর্ণনা করেছেন। তবে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন সে ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখিত পাঁচটি উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি আল-কুরআনের এমন কোন ব্যাখ্যা পেশ করে যা আল-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা সাহাবী-তাবে'ঈদের বক্তব্যের পরিপন্থী ও আরবী ভাষাগত তথ্যের বরখেলাফ হয় অথবা শরী'আতের অপর কোন মূলনীতির বিপরীত হয়, তাহলে ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। সূফীগণের কেউ কেউ আল-কুরআনের তাফসীরে এ জাতীয় নব-নব রহস্য বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের আল-কুরআন-সুন্নাহ বিশারদ উলামায়ে কিরাম সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। কারণ ইল্‌মুত্ তাফসীরের ক্ষেত্রে আল-কুরআন-সুন্নাহ এবং শরী'আতের মৌল নীতিসমূহের পরিপন্থী কারও কোন ব্যক্তিগত মতের কোনই মূল্য নেই।

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, আল-কুরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক ও জটিল কাজ। এজন্য শুধু আরবী ভাষা জানাই যথেষ্ট নয়। আল-কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য সব শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা থাকতে হবে। ইসলামী জ্ঞানে সুপণ্ডিত উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, যিনি আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসীর করবেন, তাঁকে নিম্নোল্লেখিত শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী হতে হবে ঃ

১) আরবী ভাষার ব্যাকরণ ২) অলঙ্কার শাস্ত্র ৩) আরবী ভাষা-সাহিত্য ৪) হাদীস শাস্ত্র ৫) ফিকহ শাস্ত্র ৬) তাফসীর শাস্ত্র এবং ৭) আকাইদ ও কালামশাস্ত্র।

মুফতী আমীমুল ইহসান (র) বলেন :

আল-কুরআনের তাফসীর করার জন্য নিম্নে বর্ণিত ইলমসমূহ প্রয়োজন। ১. ইলমুল-লুগাহ (আরবী আভিধানিক জ্ঞান) (২). ইলমুন-নাহু (৩). ইলমুছ-ছরফ (৪). ইলমুল ইশতিকাক (অন্য শব্দ থেকে রূপান্তরিত) ৫. ইলমুল মায়ানী (অর্থগত সৌন্দর্যের জ্ঞান) ৬. ইলমুল বয়ান ৭.ইলমুল বদী' ৮. ইলমুল কিরাত ৯. ইলমু উছূলিদ্‌দীন ১০. ইলমু উছূলিল ফিক্‌হ ১১. ইলমু আসবাবুন নুযূল ১২. ইলমুল কাছাছ ১৩. ইলমুন নাছিখ ওয়াল মানছুখ ১৪. ইলমুল মুজমাল ওয়াল মুবহাম ১৫. ইলমুল মুহাবাহ (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান)।

আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (র) আল-ইতকান গ্রন্থে লিখেছেন, নিম্নোক্ত ১৫টি বিষয়ে একজন মুফাসসিরকে পারদর্শী হতে হবে ঃ

১। আরবী ভাষার ব্যাকরণ।

২। অলংকার শাস্ত্র।

৩। আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব।

৪। হাদীস ও ইলমুল হাদীস।

৫। ফিক্‌হ।

৬। উছূলুত্ তাফসীর।

৭। আকাইদ।

৮। শানে নুযূল।

৯। নাসিখ ও মানসুখ বিষয়ক জ্ঞান (রহিতকারী ও রহিত-এর জ্ঞান)।

১০। উছূলুল্ ফিক্‌হ।

১১। উছূলুদ্‌-দীন।

১২। ইল্‌মুল কিরাআত।

১৩। ইলমুছ-ছরফ।

১৪। আল-কুরআনের বাচনভংগি ও পরিভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান।

১৫। আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান।[৫৯]

তাফসীর প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা

১. যমীর বা সর্বনাম। যমীর বা সর্বনাম প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা। যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ইস্‌ম বা নাম ব্যবহার করলে বাক্য দীর্ঘ হয় সে ক্ষেত্রে ইসম যমীর ব্যবহার করা হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيْمًا এর মধ্যে "هم" যমীরটি পঁচিশটি ইস্‌মে যাহেরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

২. যমীর তার নিকটবর্তী ইস্‌মের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। আর এ কারণেই নিম্নের আয়াতে مفعول কে مؤخر করা হয়েছে– وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ এ আয়াতে شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ প্রথম مفعول কিন্তু একে مؤخر করা হয়েছে যাতে هم যমীরের নিকটবর্তী হয়।

৩. যমীরগুলো مرجع এর অনুকূলে হবে। যখন একটি বাক্যে অনেকগুলো যমীর থাকে তখন বিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচার নিমিত্তে সবগুলোর مرجع একটি ইসম হবে। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَنْ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ এ আয়াতে উভয় যমীরের مرجع হচ্ছে মূসা (আ)। কেউ কেউ প্রথম যমীরের مرجع মূসা (আ) আর দ্বিতীয় যমীরের مرجع তাবূতকে বলেছেন। কিন্তু তা নীতিমালার পরিপন্থী।

৪. যদি যমীরের মধ্যে শব্দ ও অর্থ উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী হয়, তাহলে প্রথমতঃ শব্দ হিসেবে যমীর নিতে হবে, তারপর অর্থ হিসেবে যমীর নিতে হবে। যেমন : পবিত্র কুরআনে রয়েছে– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ (ثم قال) وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ এখানে প্রথমতঃ يقول এর মধ্যে ضمير টি من

---

৫৯. আল্‌-ইতকান, পৃষ্ঠা-৫৪২-৫৪৩

হিসেবে واحد লওয়া হয়েছে। তারপর وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ এর মধ্যে هم যমীরটি من এর অর্থের দিকে লক্ষ্য করে جمع লওয়া হয়েছে।

৫. পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। تأنيث তথা مؤنث দু'প্রকার। যথা : ক. حقيقى খ. غير حقيقى। فاعل যদি প্রকাশ্য ও مؤنث حقيقى হয় এবং فعل ও فلعل এর মাঝে কোন প্রকার فاصلة না হয়, তাহলে فعل কে مؤنث লওয়া ওয়াযিব। যথা– ضربت مريم

৬. একবচন ও বহুবচন। পবিত্র কুরআনে কোন কোন اسم কে শুধু একবচন আর কোন কোন اسم কে একবচন ও বহুবচন রূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন الارض শব্দটির বহুবচন ارضون কঠিন হওয়ার কারণে তা বহুবচন রূপে ব্যবহার হয় না। পক্ষান্তরে السماء শব্দটি এক ও বহুবচন উভয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ-لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْأَرْضِ

৭. বহুবচনের মুকাবিলায় বহুবচন লওয়া। এর মূলনীতি দু'টি। যথা–

(ক) প্রথম جمع এর প্রত্যেক একক, দ্বিতীয় جمع এর একককে বুঝাবে। যথা– حرمت عليكم امهاتكم তোমাদের প্রত্যেকের ওপর প্রত্যেকের স্বীয় মাকে হারাম করা হয়েছে। (খ) محكوم عليه এর প্রত্যেক فرد এর ওপর جمع সাব্যস্ত হবে। যেমন– فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে তোমরা আশিটি করে বেত্রাঘাত কর।

৮. ঐ সব শব্দাবলী প্রসঙ্গে যেগুলো সমার্থক মনে করা হয়, অথচ তা নয়। যেমন, خوف ও خشية কেননা, উভয়ের মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন, خشي এর মধ্যে خوف অপেক্ষা ভীতি অত্যধিক। তাই خشية কে আল্লাহর সাথে খাস করা হয়েছে যেমন– يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ.

৯. প্রশ্ন ও উত্তর। উত্তরের ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে– তা প্রশ্নের অনুযায়ী হওয়া। তবে কোন কোন সময় প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে অন্য কোন বিষয়ের উত্তর দেয়া হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর বাণী–يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ-قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ এখানে প্রশ্ন ছিল চাঁদের আকৃতি সম্পর্কে অথচ উত্তর দেয়া হলো চাঁদের উপকারিতা সম্পর্কে। এরূপ উত্তর দেয়ার কারণ হচ্ছে যে, প্রশ্নকারী সঠিক প্রশ্ন না করে ভুল প্রশ্ন করেছে।

১০. উত্তরের মধ্যে প্রশ্নটি উল্লেখ থাকা। যেমন– أَئِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ-قال أَنَا يُوسُفُ এখানে উত্তরের انا শব্দটি তাদের প্রশ্নের انت।

১১. উত্তর প্রশ্নের আকৃতিতে হওয়া। অর্থাৎ, প্রশ্নটি جملة اسمية হলে উত্তরও جملة اسمية হবে। যেমন– مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِىْ اَنْشَأَهَا।

মোদ্দাকথা

আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (র) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল-ইতকান' এ তাফসীর প্রদানের জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা বর্ণনা করেছেন, নিম্নে এগুলো সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হল ঃ

১। ইস্‌ম তথা নামবাচক শব্দের বচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, সমার্থবোধক, শাব্দিক পার্থক্য ইত্যাদি ব্যাপারে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা।

২। যমীর বা সর্বনাম সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান তথা সর্বনাম কখন একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন, আবার কখন পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং কখন নিকটবর্তী, দূরবর্তী বুঝাতে ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি জানা।

৩। প্রশ্ন-উত্তর সংক্রান্ত জ্ঞান তথা আরবী ভাষায় প্রশ্নকরণ, উত্তর প্রদান, প্রশ্ন উহ্য রেখে উত্তর প্রদান, উত্তর উহ্য রেখে প্রশ্নকরণ ইত্যাদির ব্যাপারে বিস্তারিত জানা।[৬০]

তাফসীরের প্রকারভেদ

পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় অনেক তাফসীর গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। এসব তাফসীর দু'ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

১। তাফসীর বিল মা'সুর বা তাফসীর বির-রিওয়ায়াত

আল-কুরআন, হাদীস, সাহাবা ও তাবে'ঈদের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে যে তাফসীর করা হয়, তাকে তাফসীর বিল মা'সুর বা তাফসীরে নকলী বলা হয়।[৬১] রাসূল (সা) ও সাহাবীগণের বাণীকে সকলে তাফসীর বিল মা'সূরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাবে'ঈদের বক্তব্যকে কেউ কেউ তাফসীরে আকলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

---

৬০. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (র), আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭৯-৪০০
৬১. আত্‌তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫২

ড. হোসাইন আযযাহাবী তাঁর 'আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন' গ্রন্থে এবং ড. মান্না কাত্তান তাঁর 'মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন' গ্রন্থে তাবেয়ীদের রিওয়ায়াতকে তাফসীর বিল মা'সুর হিসেবে গণ্য করেছেন।

২। তাফসীরে আকলী বা তাফসীর বির-রায়

যে তাফসীর ইজতিহাদ নির্ভর সে তাফসীরকে তাফসীর বিল মা'কুল বা তাফসীর বিদ দিরায়াতও বলা হয়। তাবে'ঈদের পরবর্তী যুগ থেকে এ ধরনের তাফসীর চর্চা শুরু হয়। আলিমদের কেউ কেউ মনে করেন, এ ধরনের তাফসীর গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মানুষ নিজস্ব চিন্তায় যা বলে তা নিছক ধারণামাত্র। এর মাধ্যমে ইয়াকীন তথা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'যে বিষয়ে তোমার সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কথা বলো না।' আল-কুরআন তথা আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে ধারণাপ্রসূত কিছু বলা মানেই আল্লাহ্‌র কালাম সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া কথা বলার শামিল। তাই ইজতিহাদের ভিত্তিতে তাফসীর করা বৈধ নয়।

কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে, ইজতিহাদের ভিত্তিতে তাফসীর করা বৈধ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনের অনেক জায়গায় আল-কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণার কথা বলেছেন। সূরা মুহাম্মাদের ২৪ আয়াতে বলেছেন, 'তারা আল-কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?' এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আল-কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য। সূরা ছোয়াদ-এর ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, 'এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।'

রাসূল (সা) ইজতিহাদকে উৎসাহিত করেছেন। যেমন, হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামান প্রেরণ করার সময় রাসূল (সা) প্রশ্ন করলেন, তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচার-ফায়সালা করবে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবের ভিত্তিতে। রাসূল (সা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যদি আল-কুরআনে তার ফায়সালা না পাও? তখন তিনি জবাব দিলেন, তাহলে সুন্নাতে রাসূলের ভিত্তিতে ফায়সালা করব। রাসূল (সা) আবারো জিজ্ঞেস করলেন, যদি এখানেও না পাও, তখন মু'আয (রা) জবাব দিলেন, তাহলে আমি ইজতিহাদ করে ফায়সালা করব। রাসূলে করীম (সা) তাঁর জবাবে সন্তুষ্ট হলেন। এ থেকে প্রমাণিত যে, কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ইজতিহাদ করা বৈধ।

বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে তাফসীরে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে সকল বিষয়ের মৌলিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন, তিনি সূরা আল আন'আমের ৩৮ নম্বর আয়াতে বলেছেন, "তাদের ভাগ্যলিপিতে কোন কিছু লিখতে আমি বাদ দিইনি।" অর্থাৎ আল-কুরআনেই সবকিছুর মৌলিক দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যদি ইজতিহাদের সুযোগ না থাকে তাহলে যুগ চাহিদা পূরণে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা কিভাবে পেশ করা হবে? এই কারণে ইজতিহাদকে প্রবহমান নদীর সাথে তুলনা করা যায়। যে নদীতে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, তা যেমনি বন্ধ্যা নদী, তেমনি ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হলে ইসলামের গতিশীলতায় বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হবে। তাই তাফসীরে ইজতিহাদের পথ বর্তমানেও খোলা আছে।

এ প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে ড. হোসাইন আযযাহাবীসহ আরো অনেকেই বলেন, তাফসীরে সব ধরনের ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। নিজের খেয়াল-খুশি মত ইজতিহাদ করে ভ্রান্ত আকীদা প্রচারে তাফসীরকে ব্যবহারের সুযোগ নেই। তাঁরা তাফসীর বির-রায়কে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন :

(১) তাফসীর বির-রায়িল মাহমুদ : অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য তাফসীর

যদি কুরআন-সুন্নাহ ও ইজতিহাদের মূলনীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদ করা হয়, কেবল তখনই তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এ ধরনের মুফাস্সিরগণ খেয়াল-খুশি অনুযায়ী বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাফসীর করেন না, বরং আরবী ভাষাজ্ঞান, আরবদের বাকরীতি, সম্বোধন পদ্ধতি, ব্যাকরণ, নাহূ, ছরফ, বালাগাত, উছূলে ফিক্হ, শানে নুযূল, ইলমে কিরাআত, নাসিখ-মানসুখ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞান নিয়ে তাফসীর করেন। এ ধরনের তাফসীরের মধ্যে আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী রচিত তাফসীরে নাসাফী, নিযামুদ্দীন নিশাপুরী রচিত তাফসীর নিশাপুরী, শিহাবুদ্দীন আলুসী রচিত তাফসীরে রূহুল মা'আনী, জালালুদ্দীন মাহাল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) রচিত তাফসীরে জালালাইন উল্লেখযোগ্য।[৬২]

(২) তাফসীর বির-রায়িল মাযমুম : অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য তাফসীর

যেসব তাফসীর মুফাসসিরের খেয়াল-খুশি, শঠতা বা ভ্রান্ত চিন্তাধারার বাস্তবায়নের জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা হয়, তাই অগ্রহণযোগ্য তাফসীর

৬২. আবদু-দ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস, সাইয়েদ কুতুব জীবন ও কর্ম, পৃষ্ঠা-২০২

তথা তাফসীর বির-রায়িল মাযমুম।[৬৩] এ ধরনের তাফসীর আরবী ভাষার ব্যাকরণ রীতি ও শরী'আতের মৌলিক নীতিমালা বিবর্জিত অবস্থায় করা হয়ে থাকে, অথবা ভ্রান্ত দর্শন ও বিদ'আতের প্রমাণ হিসেবে আল-কুরআনের আয়াত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এ ধরনের মুফাসসিরের জন্য রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী আল-কুরআনের ব্যাখ্যা করল সে যেন জাহান্নামে তার আবাস স্থির করে নেয়।[৬৪]

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তাফসীরে ইজতিহাদ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তা আল-কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক নীতিমালার আলোকে প্রণীত হবে। আরবী ভাষায় দক্ষতা ছাড়া তাফসীর করা কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আল-কুরআনের অপব্যাখ্যা দেওয়া নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এটি নিরেট বাস্তবতা যে, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে আল-কুরআনের সময়োপযোগী তাফসীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু এ প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে অনেকেই আল-কুরআনের তাফসীরের সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। কারো কারো আরবী ভাষায় দক্ষতা থাকলেও ব্যক্তি বা গোষ্ঠিগত স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য কিংবা ইসলাম বিরোধীদের সাহায্যে আল-কুরআন ব্যাখ্যার নামে আল-কুরআনের অপব্যাখ্যা করেছেন। তারা এ ধরনের ভ্রান্ত তাফসীর সাধারণ মুসলিমদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, যার ফলে অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছে। ইহুদী, নাসারা ও নাস্তিকরা মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এ ধরনের কাজে অঢেল সম্পদ ব্যয় করছে। তাদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সাহায্যে মুসলিমদের মধ্যে অনেক দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে। যারা নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তাধারা বাস্তবায়নে তাফসীরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এভাবে অতীতকাল থেকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে তাফসীর চর্চা শুরু হয় এবং আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত আছে।

কতিপয় প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ

মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর অসংখ্য তাফসীর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। আল-কুরআনের উপর এত অধিক গবেষণা ও ব্যাখ্যা-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, দুনিয়ার

---

৬৩. আবদু-দ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস, সাইয়েদ কুতুব জীবন ও কর্ম, পৃষ্ঠা-২০২
৬৪. আল-কুরআন : আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসির, পৃষ্ঠা-৬৯

অন্য কোনো গ্রন্থের ব্যাপারে তা হয়নি। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে :

১. তাফসীরে ইব্‌নুল আব্বাস

হযরত ইবনুল আব্বাস (রা)-কে বলা হয় তরজুমানুল কুরআন বা আল-কুরআনের ভাষ্যকার। হযরত উমার (রা) তাঁর মতামত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। এমনকি অনেক জটিল বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি হযরত ইবনুল আব্বাসের মতামত জানতে চাইতেন। রাসূল (সা) তাঁর জন্য বিশেষ দু'আ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে আল-কুরআনের গভীর ইলম দান করেন। মিসরের আবূ তাহের মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব ফিরোজাবাদী 'তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইব্‌নুল আব্বাস' নামে একটি তাফসীর গ্রন্থবদ্ধ করেন। তাঁর তাফসীরে প্রাচীন আরবী কবিতার অনেক উদ্ধৃতি বিদ্যমান।

২. তাফসীরে ইব্‌ন জারীর

এ তাফসীরের প্রকৃত নাম 'জামেউল-বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন'। লেখক আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্‌তাবারী (র) (জন্ম ২২৪, ওফাত ৩১০ হিঃ)। আল্লামা আত্-তাবারী একজন উঁচু স্তরের মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি অব্যাহতভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর রচনায় মগ্ন ছিলেন। প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লেখা তাঁর রুটিন ছিল। কেউ কেউ তাঁর ব্যাপারে শিয়া হবার অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু ইসলামী জ্ঞান গবেষকগণ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃত ব্যাপারও তাই। তিনি ছিলেন 'আহলে-সুন্নাত ওয়াল-জামায়াতভুক্ত' অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন বিচক্ষণ ইসলামী জ্ঞান-সমৃদ্ধ পণ্ডিত। তাঁকে মুজতাহিদ ইমামগণের একজন বলে গণ্য করা হয়। আল্লামা আত্-তাবারীর তাফসীরখানা দীর্ঘ ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। পরবর্তী তাফসীরসমূহের জন্য এ তাফসীর গ্রন্থটি মৌলিক উৎস হিসাবে গণ্য। ইমাম আত্‌তাবারী আল-কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অতঃপর যে বক্তব্যটিকে তিনি প্রবল বলে বিবেচনা করেছেন সেটাকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য তাঁর তাফসীরে 'সহীহ' বর্ণনার সাথে 'সাকীম' (প্রামাণ্য ও প্রমাণ-পদ্ধতির মাপকাঠিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে বিবেচিত) বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। এ কারণে তাঁর বর্ণিত সকল বর্ণনার উপর সমান আস্থা পোষণ করা যায় না। আসলে এ

তাফসীর লেখার সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল, ঐ সময় আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কিত যত বর্ণনা যেখানে পাওয়া যায় সবগুলো একই জায়গায় সন্নিবেশিত করা, যাতে এসব উপকরণ থেকে পরবর্তী গবেষকগণ উপকৃত হতে পারেন। তবে তিনি প্রতিটি বর্ণনার উদ্ধৃতি প্রমাণকালে তার সনদ অর্থাৎ প্রমাণ-সূত্রেরও উল্লেখ করেছেন। এর ফলে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বর্ণনাকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে উক্ত বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন।

৩. আহকামুল-কুরআন লিল-জাস্সাস

ইমাম আবু বাকর জাস্সাস রাযী (র) (ওফাত ৩৭০ হিঃ) কর্তৃক এ তাফসীরটি লিখিত। ইসলামী জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পারদর্শী হওয়া ছাড়াও আরবী ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর তাফসীরে কালামুল্লাহর বৈয়াকরণিক ও আলংকারিক দিকের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি প্রতিটি আয়াতের শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন। ফিকহী মাযহাবের দিক থেকে তিনি হানাফী মতের একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইমাম। এ তাফসীরটির বিষয়বস্তু হলো কুরআন মাজীদ থেকে বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবন। তিনি ধারাবাহিকভাবে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার বদলে কেবল ঐ সকল আয়াতেরই ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলো বিভিন্ন ব্যবহারিক নিয়ম-বিধিসম্বলিত। এ বিষয়ের উপর আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। তবে সেগুলোর চাইতে 'আহকামুল-কুরআন লিল-জাসসাস'-এর স্থানই উর্ধ্বে।

৪. তাফসীরে আবীল লাইছ

আবূ লাইস নসর ইবন ইবরাহীম হচ্ছেন এ তাফসীরের লেখক। তিনি হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন (ওফাত ৩৭৩ মতান্তরে ৩৭৫)।[১] তিনি ফিকহ শাস্ত্রেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কিতাবুন নাওয়াযেল ফিল ফিক্‌হ গ্রন্থটি তারই প্রমাণ। এছাড়া তিনি আরো অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁর রচিত তাফসীর বাহরুল উলূম তাফসীর শাস্ত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

এ তাফসীরটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। এতে তাফসীর শিক্ষা ও তার ফযীলত শীর্ষক এক অধ্যায়ে তিনি উল্লেখ করেন, নিছক ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে তাফসীর করা বৈধ নয়। তাঁর মতে আল-কুরআনের তাফসীর করার জন্য আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে। হাদীসের আলোকে ও পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের মতের ভিত্তিতে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে হবে। তিনি তাঁর তাফসীরে সাহাবা ও

তাবেয়ীদের বক্তব্য এবং পূর্ববর্তী মুফাস্‌সিরদের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন জনের পরস্পর বিপরীত অভিমত উল্লেখ করেছেন। ইব্‌ন জারীরের ন্যায় তিনি একটি মতের উপর আরেকটির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেননি। তাঁর তাফসীরে কিছু কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা দেখা যায়।

৫. তাফসীরে সা'লাবী

এ তাফসীরের লেখক হচ্ছেন আবূ ইসহাক আহমাদ ইবন ইবরাহীম সা'লাবী নিশাপুরী। তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায়নি। তবে তিনি ৪২৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন বলে কথিত আছে। তিনি সাহিত্যিক, ওয়ায়েজ, হাফিযে কুরআন ও মুফাসসির হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ লিখেন। তবে তাঁর তাফসীর 'আল কাশফু ওয়াল বায়ানু আন তাফসীরিল কুরআন'-এর জন্যই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। এ তাফসীরে তিনি বিভিন্ন মতামত দলীলসহ উল্লেখ করেছেন। নাহু সংক্রান্ত আলোচনা এবং ফিকহী মাসায়েলও তুলে ধরেছেন। তবে ফিকহ আলোচনা করার ক্ষেত্রে শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মতামত বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী তাফসীরকারদের মতামত যাচাই-বাছাই ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।

৬. তাফসীরে বাগভী

এ তাফসীরটির পুরোনাম 'মা'আলেমুত তানযীল'। আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাসউদ ইবন মুহাম্মাদ আল ফাররা আল বাগভী এ তাফসীর লিখেছেন (ওফাত ৫১০, মতান্তরে ৫১৬)। তাফসীরের পাশাপাশি হাদীস শাস্ত্রেও তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি মহীউস সুন্নাহ ও রুকনুদ্দীন উপাধিতে ভূষিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই আল্লাহভীরু ছিলেন এবং অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তিনি আল-কুরআন, হাদীস ও ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো গ্রন্থ লিখেন। তবে তাঁর রচিত তাফসীরে তিনি বিদ'আতপন্থীদের কোন মতামত উল্লেখ করেননি। রাসূল (সা)-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক যাচাই-বাছাই করেছেন। তাফসীরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, এমন কোন ধরনের আলোচনা তিনি করেননি। কয়েক স্থানে ইসরাঈলী বর্ণনার উল্লেখ থাকলেও সামগ্রিকভাবে এটি ভাল তাফসীর গ্রন্থ।

৭. তাফসীরে কাশ্‌শাফ

পূর্ণ নাম "আল কাশ্‌শাফু আন হাকাইকীত তানযীল ওয়া উয়ুনিল আকাবীল ফি উজুহিত তাবিল"। লেখকের পূর্ণ নাম আবুল কাসেম জারুল্লাহ মাহমুদ ইবন উমার ইবন খাওয়ারিযমী আয্‌যামাখশারী। দীর্ঘদিন যাবৎ বাইতুল্লাহ শরীফে অবস্থান গ্রহণকারী এ মহামনীষী ৪৬৭ হিজরীর রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ৫২৮ হিজরী সালে আরাফাতের রাতে খাওয়ারিযম নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৬২ বছর। তিনি মুতাযিলী আকীদার লোক ছিলেন। লেখক তার জীবদ্দশায় বহুগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হচ্ছে- তাফসীরে **কাশশাফ**, আছাছুল বালাগাত ফিল্‌-লুগাত, রাবিউল আবরার, খুদুদুল আখবার ইত্যাদি। তবে তাফসীরে কাশ্‌শাফ গ্রন্থখানা সমধিক পরিচিত ও সর্বজন গৃহিত একটি তাফসীর। এ গ্রন্থখানা ৪টি বড় বড় খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়েছে। এতে সাহিত্য অলংকারে পূর্ণ আলোচনা, বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রশ্ন ও উত্তর, মু'তাযিলা আকীদাকে প্রাধান্য দান এবং অনেক ক্ষেত্রেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে।

৮. তাফসীরে ইবন আতিয়্যা

এ তাফসীরের লেখক হচ্ছেন আবূ মুহাম্মাদ আবদুল হক ইবন গালিব ইবন আতিয়া আল আন্দালূসী। ৪৮১ হিজরীতে তাঁর জন্ম হয় এবং ৫৪৬ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই তাফসীরটি বার খণ্ডে বিভক্ত। ইবন তাইমিয়া এ তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এ তাফসীরটি বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতের সমষ্টি, বিদ'আত ও ভ্রান্ত ধারণামুক্ত। তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর তাফসীরের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি আল-কুরআনের আয়াত উল্লেখ করার পর প্রাঞ্জল ভাষায় তাফসীর করেছেন। আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করে তাঁর নিজস্ব মতামতও পেশ করেছেন। কখনো কখনো আরবী কবিতার উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। নাহুর কায়দা ও আভিধানিক বিশ্লেষণও তাঁর তাফসীরে দেখা যায়। যেসব শব্দে একাধিক পঠনরীতি আছে তারও উল্লেখ রয়েছে।

৯. তাফসীরে কাবীর

এ তাফসীর লিখেছেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) (ওফাত ৬০৬ হিঃ)। কিতাবের নাম 'মাফাতীহুল-গাইব'। কিন্তু পরবর্তীকালে 'তাফসীরে কাবীর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইমাম রাযী ছিলেন 'কালামশাস্ত্রের' ইমাম। এ কারণেই তাঁর তাফসীরে যুক্তি, কালামশাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা এবং বাতিলপন্থীদের বিভিন্ন

মতবাদ খণ্ডনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বস্তুত আল-কুরআনের মর্মার্থ উদঘাটনের দিক থেকে এটি একটি অতুলনীয় তাফসীর গ্রন্থ। এ তাফসীরে যে হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে আল-কুরআনের মর্মবাণী বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়েছে তা অতি চমৎকার। কিন্তু ইমাম রাযী (র) সূরা আল-ফাতহ পর্যন্ত এ তাফসীর নিজে লিখেছেন। তারপর তিনি আর লিখতে পারেননি। অবশিষ্ট অংশ লিখেছেন কাযী শাহাবুদ্দীন ইব্ন খলীলুল-খোলী দামেশকী (ওফাত ৬৩৯ হিঃ)। মতান্তরে শায়খ নাজমুদ্দীন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কামুলী (ওফাত ৭৭৭ হিঃ)।

১০. তাফসীরুল-কুরতুবী

এ তাফসীরের পুরো নাম 'আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন।" স্পেনের খ্যাতনামা গবেষক আলিম আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইবন আবু বাকর ইবন ফারাগ আল-কুরতুবী (ওফাত ৬৭১ হিঃ) হচ্ছেন এ তাফসীরের লেখক। তিনি ফিক্হী মাযহাবের দিক থেকে ইমাম মালিকের মতানুসারী। ইবাদাত ও সাধনার দিক থেকে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। মূলত এ গ্রন্থের মৌলিক বিষয়বস্তু ছিল কুরআন মাজীদে ব্যবহারিক বিধিসমূহের উদ্ভাবন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি আয়াত ও জটিল শব্দসমূহের ব্যাখ্যা, 'এরাব' (স্বর-চিহ্ন), ভাষার অলঙ্কার ও সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহও সন্নিবেশিত করেছেন। তাফসীরে-কুরতুবী মোট ১২ খণ্ডে বিভক্ত এবং এর বহু সংস্করণ বের হয়েছে।

১১. তাফসীরে বায়যাভী

পূর্ণ নাম 'আনওয়ারুত তানযীল ওয়াআছরারুত তাবিল'। লেখকের জন্ম স্থানের সাথে সম্পর্কিত করে তার নাম রাখা হয় তাফসীরে বায়যাভী। লেখকের পূর্ণ নাম ইমাম কাযী নাসীরুদ্দীন আবুল খায়ের আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আশশিরাজী আল বায়যাভী আশশাফেয়ী (মৃত্যু ৬৮৫)। তিনি তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ ও স্বনামধন্য একজন বিচারক ছিলেন এবং আরবী সাহিত্যসহ হাদীস ও উছূলে কুরআনের জ্ঞানে অনন্য ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও মৃত্যু হয়েছে ৬৮২ হিজরী সনে তিবরিয নামক স্থানে। তাফসীরে বায়যাভী মোট ২টি খণ্ডে সমাপ্ত। এতে তিনি মু'তাযিলী আক্বিদাকে খণ্ডন করণ, আয়াতের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিধান ও প্রসঙ্গ, ইলমে বয়ান, ইলমে নাহু, ছরফ, বালাগাত, ফাসাহাত সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১২. তাফসীর আল-বাহরুল-মুহীত

আল্লামা আবু হাইয়্যান গারনাতী আন্দালুসী (ওফাত ৭৫৪ হিঃ) কতৃর্ক এ তাফসীরটি লিখিত। ইসলামী জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পারদর্শী হওয়া ছাড়াও আরবী ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তাঁর তাফসীরে কালামুল্লাহর বৈয়াকরণিক ও আলংকারিক দিকের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি প্রতিটি আয়াতের শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন।

১৩. তাফসীরে ইব্ন কাসীর

এ তাফসীরের লেখক হাফিয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাসীর দামেশকী আশ্ শাফেয়ী (র) (ওফাত ৭৭৪ হিঃ)। তিনি হিজরী অষ্টম শতকের বিশিষ্ট গবেষক-পণ্ডিত আলিমদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর তাফসীরটি চার খণ্ডে প্রকাশিত। আল-কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহই তাতে বেশী স্থান পেয়েছে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, লেখক বিভিন্ন বর্ণনায় মুহাদ্দিসসুলভ সমালোচনা করেছেন। এজন্য তাফসীরে ইব্ন কাসীর এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

১৪. তাফসীরে ছা'আলাবী

এটির পুরো নাম 'আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন লিছ ছা'আলাবী।' লেখক আবু যায়িদ আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ আছ-ছা'আলাবী আল-জাযাযেরী আল-মালিকী (র) (ওফাত ৮৭৬ হিঃ)। তিনি অষ্টম শতকের বিশিষ্ট আলিম, গবেষক ও আল্লাহভীরু ছিলেন। তিনি তাঁর এ তাফসীরে প্রায় একশত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন। এতে আল্লাহভীতি, আখিরাতের জীবন ইত্যাদি আল-কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এটি চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

১৫. তাফসীর আদ-দুর্রুল-মানসূর

এ তাফসীরের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (জন্ম ৮৪৯, ওফাত ৯১০ হিঃ)। এর পুরা নাম 'আদ-দুররুল-মানসূর ফী তাফসীর বিল মাসূর'। তাতে লেখক নিজের সাধ্যানুযায়ী আল-কুরআনের ব্যাখ্যাসম্বলিত সকল আয়াতকে এক জায়গায় সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পূর্বে হাফেয ইব্ন জারীর (র), ইমাম বাগভী (র), ইব্ন মরদভিয়া (র), ইব্ন হাইয়্যান (র) প্রমুখ হাদীসবেত্তা নিজ নিজ পদ্ধতিতে এ কাজ করেছেন।

আল্লামা সুয়ূতী তাঁদের সকলের বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ তাঁর গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। তবে তিনি প্রতিটি রেওয়ায়াতের সাথে ঐগুলোর পুরো সনদ (প্রমাণ সূত্র)-এর উল্লেখ না করে কেবল লেখকের নামই উল্লেখ করেছেন, যিনি নিজের সনদে উক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তাতে প্রয়োজনে সনদ অনুসন্ধান করা যাবে। যেহেতু তাঁর লক্ষ্য ছিল সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহ একত্রিত করা, এ কারণে সুয়ূতীর তাফসীর গ্রন্থেও প্রামাণিক ও প্রমাণ সূত্রের দিক থেকে দুর্বল বর্ণনা স্থান পেয়েছে। প্রমাণ-সূত্রের অনুসন্ধান না করে তাঁর বর্ণিত সকল রিওয়ায়াতকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না। আল্লামা সুয়ূতী (র) ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিটি রিওয়ায়াতের সাথে তার সনদ বা প্রমাণ-সূত্র কোন্ ধরনের সে ব্যাপারেও আলোকপাত করেছেন। কিন্তু হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা স্পষ্ট। কাজেই এ ব্যাপারেও নির্বিচারে পূর্ণ আস্থা আনা মুশকিল।

১৬. রূহুল মা'আনী

তাফসীরটির পুরো নাম 'রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল-আযীম ওয়াস সাবয়িল মাসানী'। বাগদাদের পতনকালের অব্যবহিত আগের প্রখ্যাত ইসলামী জ্ঞানবিশারদ আল্লামা মাহমুদ আলুসী (র) (ওফাত ১১৩৭) এ তাফসীরখানা লিখেছেন। তাফসীরে রূহুল-মা'আনী ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। লেখক এ বিরাট তাফসীর গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গীন ও ব্যাপকভিত্তিক করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার ছাড়াও তিনি এতে ইসলামী বিধি-বিধান, আকাইদ-বিশ্বাস, কালাম-শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাছাউফ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। হাদীসের উদ্ধৃতি দানেও এ গ্রন্থের লেখক অন্যান্য তাফসীরকারের তুলনায় অধিক সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৭. তাফসীরে জালালাইন

দু'জন প্রসিদ্ধ আলিম কর্তৃক এ তাফসীর লিখিত হয়। তাঁরা হচ্ছেন– আল্লামা জালালুদ্দীন মাহাল্লী ও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী। জালালুদ্দীন মাহাল্লী সূরা আল কাহফ থেকে সূরা আন্ নাস পর্যন্ত তাফসীর করার পর সূরা আল ফাতিহার তাফসীর করেন। এরপর তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। তারপর জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) সূরা আল বাকারা থেকে সূরা আল ইসরা পর্যন্ত তাফসীর করেন। এ তাফসীরে অনেক ইসরাঈলী বর্ণনা বিদ্যমান। তবে দু'জনই চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

১৮. তাফসীরে মাযহারী

এটি আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) (ওফাত ১২২৫ হিঃ) প্রণীত। লেখক তাঁর আধ্যাত্মিক ওস্তাদ মাযহার জানে-জানান দেহলভী (র)-এর নামানুসারে এ তাফসীরের নামকরণ করেছেন। এটি একটি সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল তাফসীর গ্রন্থ। সংক্ষেপে আল-কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা জানার জন্যে অতীব উপকারী। লেখক আল-কুরআনের শব্দাবলীর বিশ্লেষণের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। অপরাপর তাফসীরের তুলনায় এ গ্রন্থে হাদীসের উদ্ধৃতি দানে সতর্কতা অবলম্বনের ছাপ সুস্পষ্ট।

১৯. মা'আরেফুল কুরআন

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র) (ওফাত ১৩৯৬, ৯ই শাওয়াল) স্বয়ং বলেন, কুরআন শরীফের একখানা স্বতন্ত্র তাফসীর রচনা করার দুঃসাহস ছিল আমার স্বপ্নেরও অতীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতেই আল্লাহ পাকের খাস রহম করমে তাফসীরে মা'আরেফুল-কুরআন রচনার সকল উপকরণ একত্রিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা পরিপূর্ণ 'তাফসীর'-এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এতে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যথা ঃ ১. আয়াতের সাধারণ তরজমা করা হয়েছে। অতঃপর ব্যাখ্যামূলক তরজমা করা হয়েছে। ২. ফিক্‌হ-সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করে কুরআন শরীফের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সহজ ধারণা অর্জন করা যাতে সহজ হয়, তার চেষ্টা হয়েছে। ৩. তৃতীয় কাজ হচ্ছে 'মা'আরেফ ও মাসায়েল'। প্রকৃতপক্ষে এটুকুও আমার নিজের না বলে পূর্ববর্তী সাধক আলিমগণের তাফসীর থেকে মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ বলা যেতে পারে। আমি সহজ উর্দু ভাষায় যথাস্থানে হাওয়ালাসহ বক্তব্যগুলো পরিবেশন করেছি মাত্র। এ ব্যাপারেও আমি যে কয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি, তা হচ্ছে– (ক) আলিমগণের পক্ষে কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রতিটি শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ, ব্যাকরণগত দিক, অলংকার শাস্ত্রের বিচারে সংশ্লিষ্ট আয়াতের বিচার-ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ক্বিরাআত সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও মর্মোদ্ধারের জন্য এ দিকটা ঠিকমত উদ্ধার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাফসীরে মা'আরেফুল-কুরআনে সাধারণ পাঠকগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শব্দের ব্যাখ্যা, ব্যাকরণের জটিল বিশ্লেষণ প্রভৃতির অবতারণা করা হয়নি। শুধু তাফসীরবিদ ইমামগণের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে গ্রহণযোগ্য মতটুকুই উদ্ধৃত করে

দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রয়োজনের খাতিরে সে ধরনের বিশ্লেষণের অবতারণা করা হলেও জটিল আলোচনা বাদ দিয়ে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে সেটুকু পরিবেশন করা হয়েছে। একই কারণে এমন সব আলোচনা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় বা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর হতে পারে। (খ) নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে এমন সব তথ্য ও আলোচনাই শুধু উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেগুলো পাঠ করলে আল-কুরআনের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য বাড়ে, কুরআনের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, আমল করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

২০. তাফহীমুল কুরআন

এ তাফসীরটি সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) রচনা করেছেন। তিনি এর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য আল-কুরআনকে আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ১৯৪২ সালে তিনি এ তাফসীর লেখা শুরু করেন এবং ৩০ বৎসরে লেখা শেষ করেছেন। রাসূল (সা)-এর যুগের পর যত তাফসীর লেখা হয়েছে, সে সবই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে আল-কুরআনকে বাস্তবে মেনে চলার জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও উপযোগী। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ছিল বিধায়, তখন এসব তাফসীর মুসলিম উম্মাহর বিরাট খিদমতে এসেছে। যেহেতু তখন আল্লাহর দীন ও ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ কায়েম ছিল সেহেতু তখন ইসলামকে নতুন করে কায়েম করার জন্য আন্দোলনের দরকার ছিল না, তাই ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে তাফসীর লেখা সময়ের দাবীও ছিল না।

মাওলানা মওদূদী (র) যখন তাফসীর লিখেছেন তখন এ উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র, আইন, আদালত ইত্যাদি ছিল না। ফলে ইকামাতে দীনের আন্দোলনের কাজ শুরু করা প্রয়োজন হয়েছে। এবং আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে আল-কুরআনের এ তাফসীর লেখা তিনি জরুরী মনে করেছেন।

মাওলানা তাঁর এ তাফসীরে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, ইবাদাত, নৈতিকতা, ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক সম্পর্ক, দাম্পত্য জীবন, সামাজিক আচার-আচরণ, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ও বিচারনীতিসহ পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনধারার যুগোপযোগী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। এ তাফসীর সীরাত ও সুন্নাতে রাসূলের যেন এক মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

তিনি মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পরিচালনার নির্দেশনাকে সীরাতে রাসূল, সাহাবায়ে কিরামের জীবনধারা ও বর্তমানকালের বাস্তবতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পেশ করেছেন চমৎকারভাবে। তাই ইসলামী আন্দোলনকে বুঝতে হলে এবং আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের দায়িত্ব পালন করতে হলে এ তাফসীর পড়া খুবই জরুরী। এ তাফসীরটি উর্দুতে মোট ৬ খণ্ডে রচিত হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় এটির অনুবাদ করা হয়েছে। আধুনিক প্রকাশনী এটি ১৯ খণ্ডে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছে।

২১. ফী যিলালিল কুরআন

এটির পুরো নাম 'ফী যিলালিল কুরআন'। এটি রচনা করেন এ কালের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ, মুসলিম উম্মাহর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র)। তিনি ছিলেন একাধারে বিখ্যাত লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রখর দীনী জ্ঞান সম্পন্ন আলিম (জন্ম ১৯০৬, শহীদ ১৯৬৬)। ফী যিলালিল কুরআন হচ্ছে সাইয়েদ কুতুবের শ্রেষ্ঠ অবদান। এটি আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীর গ্রন্থ। তিনি এতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা তুলে ধরেছেন। এটি তাফসীর বির রায়-এর অন্তর্ভুক্ত। এতে তাঁর ইজতিহাদলব্ধ অনেক বিষয় বিদ্যমান। কুরআন সুন্নাহর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে কোন ইজতিহাদ তিনি করেননি। এতে অনেক হাদীস বিদ্যমান। সাইয়েদ কুতুব তাঁর তাফসীর গ্রন্থের উৎস হিসেবে কুরআন, হাদীস, সাহাবা ও তাবে'ঈদের বক্তব্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি এ তাফসীরের মাধ্যমে অধ্যয়নকারীর অন্তরে আবেগ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যে, বান্দার সাথে আল্লাহর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর এ তাফসীরে ইসলামী আন্দোলনের বিস্তারিত গাইড লাইন বিদ্যমান। এতে রয়েছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণ। তাই মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই এটি পঠিত ও আলোচিত। (সাইয়েদ কুতুব ঃ জীবন ও কর্ম পৃঃ ২১৭-২২০)। তিনি এটি ১৯৫২ থেকে শুরু করে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত লিখে শেষ করেন। এটি আট খণ্ডে প্রথম প্রকাশ পায়। এটি বর্তমানে বাংলাভাষায় ২২ খণ্ডে অনূদিত হয়েছে।

২২. রাওয়াইউল বায়ান

এই তাফসীরটির পুরো নাম 'রাওয়াইউল বয়ান তাফসীরু আয়াতিল আহকাম মিনাল কুরআন'। এটি রচনা করেছেন মুহাম্মাদ আলী আস্‌সাবুনী। তিনি এ তাফসীরে আল-কুরআনের বিধি-বিধান সংক্রান্ত আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে আধুনিক

পদ্ধতিতে ফুকাহায়ে কিরামের প্রমাণাদি এবং বিধিবিধান বৈধতার সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দিকগুলো আলোচনা করেছেন। তাঁর এ তাফসীরটি দু'খণ্ডে সমাপ্ত। ১৯৭১ খ্রীঃ আরবী ভাষায় এটি প্রথম মুদ্রিত হয়।

২৩. ছাফওয়াতুত তাফাসীর

কিতাবের পূর্ণ নাম 'ছাফওয়াতুত তাফাসীর তাফসীরুন লিল কুরআনিল কারীম'। লেখক শায়খ মুহাম্মাদ আলী আস্‌সাবুনী। পূর্ণ পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি এ তাফসীরগ্রন্থ ১৯৮৯ খ্রীঃ সমাপ্ত করেন। এটি পবিত্র আল-কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীর হিসেবে উলামায়ে কিরামের নিকট স্বীকৃত। এ গ্রন্থে সহজ সাবলীল ভাষায় তাফসীর করা হয়েছে। আল-কুরআনের বিধানাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বহু নামকরা তাফসীর গ্রন্থের সারসংক্ষেপ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো সাবলিল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এর আরো একটি বিশেষ দিক হল, শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং আয়াতের প্রেক্ষাপটও তুলে ধরা হয়েছে। এতে সূরার প্রারম্ভে সংক্ষিপ্তাকারে ঐ সূরার বর্ণনা-ভাবধারা ও উদ্দেশ্য, পূর্ব-পরের আয়াতের মধ্যে সম্পর্ক, আরবী ভাষায় শব্দের সহজ প্রতিশব্দ, শানে নুযূল, সাহিত্যের অন্যতম বিষয় বালাগাত ও ফাছাহাতের প্রতি পূর্ণ নজর রাখা হয়েছে।

২৪. আযওয়াউল বায়ান

এটির পুরো নাম 'আযওয়াউল বায়ান ফী ইযাহিল কুরআনি বিল কুরআন।' লেখক মুহাম্মাদ আল-আমীন ইবন মুহাম্মাদ আল-মুখতার আশ-শানকীতি (র)। তিনি ১৯৯৩ সালে পবিত্র হজ্জ আদায়ের পর মক্কা শরীফে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে মা'আল্লা কবরস্থানে দাফন করা হয়। এ তাফসীরে তাওহীদ, ফিক্‌হ, উলূমুল কুরআন ইত্যাদি বিষয় সাহিত্যের আলোকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বিশ্বাসের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এটিকে বর্তমান বিশ্বে তাফসীরের বিশ্বকোষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি ১৯৮৮ সালে দশ খণ্ডে প্রকাশ পায়।

মুফাসসিরগণের স্তর

উলামায়ে কিরাম মুফাসসিরগণের স্তরসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী (র) তাঁর সময়কাল পর্যন্ত প্রায় আটটি স্তর

নিরূপণ করেন। তাফসীরে হাক্কানীর রচয়িতা মাওলানা আবদুল হক দিহ্‌লভী তাঁর সময়কাল পর্যন্ত নয়টি স্তর বিন্যাস করেন। মাওলানা আবদুস সামাদ আল-আফছারী দ্বাদশ স্তর পর্যন্ত বর্ণনা করছেন। স্তরসমূহ বিন্যাস করার অর্থ এই নয় যে, যেসব নাম বিভিন্ন স্তরে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরাই মুফাসসির। মূলত প্রত্যেক যুগের দু'চারজন তাফসীরবেত্তার নাম লিখিত হয়েছে। তাঁদের সমসাময়িক বাদবাকীরা সেই স্তরেই পরিগণিত হবেন। সকল মুফাসসিরের পূর্ণ তালিকা তৈরী করা সত্যিই কষ্টসাধ্য।

প্রথম স্তর : আসহাবুন-নবী (সা)

নবী করীম (সা) এর সকল সাহাবীই ছিলেন মুফাসসিরে কুরআন। অবশ্য তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন দশজন সাহাবী। তাঁদের মধ্যে হযরত আলী (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস ছিলেন (রা) তাফসীর করার ক্ষেত্রে শীর্ষে।

১। খলীফাতুর রাসূল আবু বাকর আস সিদ্দিক (রা) (মৃ. ১৩ হি.)
২। আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) (মৃ. ২৪ হি.)
৩। আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইবনু আফফান (রা) (মৃ. ৩৫ হি.)
৪। আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবন আবী তালিব (রা) (মৃ. ৪০ হি.)
৫। আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) (মৃ. ৩৪ হি.)
৬। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) (মৃ. ৭৮ হি.)
৭। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা) (মৃ. ৭৩ হি)
৮। উবাই ইবন কা'ব (রা) (মৃ. ৩৫ হি.)
৯। যায়িদ ইবন সাবিত (রা) (মৃ. ৪৫ হি.)
১০। আবু মূসা আল আশ'আরী (রা) (মৃ. ৪৪ হি.)

দ্বিতীয় স্তর

১। মুররা হামাদানী (মৃ. ৭৬ হি.)
২। আবুল আলিয়া (রা) (মৃ. ৯০ হি.)
৩। সাঈদ ইবন যুবায়ের (রা) (মৃ. ৯৫ হি.)
৪। ইকরামা (রা) (মৃ. ১০৫ হি.)
৫। দাহহাক ইবন মাযাহিম (রা) (মৃ. ১০৫ হি.)
৬। তাউস ইবন কাইসান (রা) (মৃ. ১০৬ হি.)
৭। হাসান বসরী (র) (মৃ. ১১০ হি.)
৮। আতিয়া আওফী (র) (মৃ. ১১১ হি.)

৯। আতা ইবন আবী রাবাহ (মৃ. ১১২ হি.)
১০। কাতাদা ইবন দা'আমা (র) (মৃ. ১১৭ হি.)
১১। মুহাম্মাদ ইবন কা'ব কুরাজী (র) (মৃ. ১২০ হি.)
১২। আবুল হাজ্জাজ ইবন যুবায়ের মুজাহিদ (র) (মৃ. ১২২ হি.)
১৩। আত্তার ইবন আবী মুসলিম খুরাসানী (র) (মৃ. ১৩৫ হি.)
১৪। যায়িদ ইবন আসলাম (র) (মৃ. ১৩৬ হি.)
১৫। রবী ইবন আনাস (র) (মৃ. ১৪০ হি.)
১৬। আবদুর রহমান ইবন আসলাম (র) (মৃ. ১৮২ হি.)
১৭। আবু মালিক (র) প্রমুখ।

তৃতীয় স্তর

১। সুফিয়ান ইবন উ'য়াইনাহ (র) (মৃ. ১৯৮ হি.)
২। ওকী ইবন আলজাররাহ (র) (মৃ. ১৯৭ হি.)
৩। শু'রাতু ইবন আল হাজ্জাজ (র) (মৃ. ১৬০ হি.)
৪। ইয়াযীদ ইবন হারুন,
৫। আবদুর রাজ্জাক ইবন হুমাম (র) (মৃ. ২১১ হি.)
৬। আদম ইবন আবী ইয়াছ (র) (মৃ. ২২০ হি.)
৭। ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ (র) (মৃ. ২৩৮হি.)
৮। রাওহ ইবন উবাদা (র) (মৃ. ২০৫ হি)
৯। আবদ ইবন হামীদ (র) (মৃ. ২৪৯ হি.)
১০। সানীদ ইবন দাঊদ (র) (মৃ. ২২০ হি.)
১১। আবু বাকর ইবন আবী শাইবাহ (র) (মৃ. ২৩৫ হি.)
১২। ইবন জুরাইজ (র) (মৃ. ১৫০ হি.)
১৩। ইসমাঈল সা'দী ইবন আবদুর রহমান (র) (মৃ. ১২৭ হি.)
১৪। মুকাতিল ইবন সুলাইমান (র) (মৃ. ১৫০ হি.)
১৫। মুহাম্মাদ ইবন সাইব কালবী কূফী (র) (মৃ. ১৪৬ হি.)
১৬। ইবন কুতাইবা আবু মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম দানইউরী (র) (মৃ. ১৭৬ হি.)।

চতুর্থ স্তর

১। আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী (র) (মৃ. ৩১০ হি.)
২। আবুল কাসিম ইব্রাহিম আনমাতী (র) (মৃ. ৩০৩ হি.)

৩। আবদুর রহমান ইবন আবী হাতিম (র) (মৃ. ৩০৫ হি.)
৪। আবু আবদুল্লাহ আল হাকিম (র) (মৃ. ৪০৫ হি.)
৫। ইবন হিব্বান আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ (র) (মৃ. ৩৫৪ হি.)
৬। ইবন মারদাওয়াইহ (র) (মৃ. ৪১০ হি.)
৭। আবুশ শায়খ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ (র) (মৃ. ৩৬৯ হি.)
৮। আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম নিশাপুরী (র) (মৃ. ৩১৮ হি.)
৯। আবু হানীফা দানইউরী (র) (মৃ. ২০৯ হি.)।

পঞ্চম স্তর

১। আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ ইবন হুসাইন সুলামী নিশাপুরী (র) (মৃ. ৪১২ হি.)
২। আবু ইসহাক আহমদ সা'লাবী (র) (মৃ. ৪২৭ হি.)
৩। আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ জুওয়াইনী (র) (মৃ. ৪৩৮ হি.)
৪। আবুল কাসিম আবদুল করীম কুশাইরী (র) (মৃ. ৪৬৫ হি.)
৫। আবুল হাসান আহমদ ওয়াহিদী নিশাপুরী (র) (মৃ. ৪৬৮ হি.)।

ষষ্ঠ স্তর

১। আবুল কাসিম ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ ইস্পাহানী (র) (মৃ. ৫৩৫ হি.)
২। আবুল কাসিম হুসাইন রাগিব ইস্পাহানী (র) (মৃ. ৫০৩ হি.)
৩। ইমাম আবু হামীদ মুহাম্মাদ ইবন আল গাযালী (র) (মৃ. ৫০৫ হি.)
৪। আবু মুহাম্মাদ হুসাইন মাহমুদ বাগভী (র) (মৃ. ৫১৬ হি.)
৫। ইবন বারজান আবুল হাকাম আবদুস সালাম ইবন আবদুর রহমান (র) (মৃ. ৫৩৬ হি.)
৬। আবুল হাসান আলী ইবন ইরাক খাওয়ারিযমী (র) (মৃ. ৫৩৯ হি.)
৭। আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবন উমার যামাখশরী (র) (মৃ. ৫৩৮ হি.)

সপ্তম স্তর

১। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) (মৃ. ৬০৬ হি.)
২। মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর রাযী (র) (মৃ. ৬০৬ হি.)
৩। নাজমুদ্দীন যাহিদী (র) (মৃ. ৬৮৮হি.)
৪। আবু মুহাম্মাদ রুযবাহান (র) (মৃ. ৬০৬ হি.)
৫। ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবন আহমদ আল আনসারী (র) (মৃ. ৬৭৮ হি.)

৬। মুআফ্ফাকুদ্দীন আহমদ ইবন ইউসুফ মাওসিলী (র) (মৃ. ৬৮১ হি.)

৭। কাজী আবু সাঈদ নাছীরউদ্দিন আবদুল্লাহ ইবন উমার আল বায়যাভী (র) (মৃ. ৬৮৫ হি.)।

অষ্টম স্তর

১। আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবন আহমদ নাসাফী (র) (মৃ. ৭১০ হি)

২। হায়বাতুল্লাহ শরফুদ্দীন আবদুর রহীম (র) (মৃ. ৭১০ হি.)

৩। আবুল ফিদা ইমাদ ইসমাইল ইবন উমার ইবন কাসীর (র) (মৃ. ৭৭৪ হি.)

৪। শরফুদ্দীন আবদুল ওয়াহিদ ইবন মুনীর (র) (মৃ. ৭৩৩ হি)

৫। কুতুব উদ্দিন মাহমুদ ইবন মাসউদ শিরাযী (র) (মৃ. ৭১০ হি)

৬। শরফুদ্দীন তিবী (র) (মৃ. ৭৪৩ হি.)।

নবম স্তর

১। জালালউদ্দীন মাহাল্লী (র) (মৃ. ৮৬৪ হি.)

২। আলী ইবন আহমদ মাহাইমী (র) (মৃ. ৮৩৫ হি.)

৩। মালিকুল উলামা শিহাবউদ্দিন (র) (মৃ. ৮৩৫ হি.)

৪। সা'দউদ্দিন তাফতাযানী (র) (মৃ. ৭৯৩ হি.)

৫। মোল্লা হুসাইন ওয়ায়িজ কাশিফী (র) (মৃ. ৯০০ হি.)

৬। আবু ফারআ ওয়ালীউদ্দিন ইরাকী (র) (মৃ. ৮৩১ হি.)

৭। আবদুর রহমান উমার বিলকীনী (র) (মৃ. ৮১৮ হি.)

৮। মুফতী আবুস সউদ (র) (মৃ. ৯৮২ হি.)

৯। ইসামউদ্দিন ইসফারাঈনী (র) (মৃ. ৯৪৩ হি.)

১০। আবুল ফায়েজ (র) (মৃ. ১০০৪ হি.)

১১। জালালউদ্দিন সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১ হি.)।

দশম স্তর

১। কাজী মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ শাওকানী (র) (মৃ. ১২৫৫ হি.)

২। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) (মৃ. ১২২৫ হি.)

৩। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দিহলভী (র) (মৃ. ১১৭৬ হি.)

৪। শাহ আবদুল কাদির দিহলভী (র) (মৃ. ১২৩০ হি.)

৫। শাহ আবদুল আযীয দিহলভী (র) (মৃ. ১৩৩৯ হি.)

৬। আল্লামা মাহমুদ আলুসী বাগদাদী (র) (মৃ. ১৩০৪ হি.)

৭। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (র) (মৃ. ১৩০৭ হি.)

৮। সুলাইমান জামাল (র) (মৃ. ১২০০ হি.)

৯। নওয়াব কুতুবউদ্দিন খান (র) (মৃ. ১২৬৫ হি.)

১০। মওলবী ফয়জুল হাসান (র) (মৃ. ১২৬৫ হি.)।

একাদশ স্তর

১। মাওলানা আহমদ হাসান আমরূহী (র) (মৃ. ১৩৩০ হি.)

২। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (র) (মৃ. ১৩৩৯ হি.)

৩। নওয়াব ওয়াক্কার নওয়াব জঙ্গ, মাওলানা আবদুল খালিক দিহলভী (র) (মৃ. ১৯০০ হি.)

৪। আল্লামা রশীদ রিযা মিসরী (র) (মৃ. ১৩৫৪ হি.)

৫। মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু (র) (মৃ. ১৯০৫ হি.)।

দ্বাদশ স্তর

১। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)

২। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (র)

৩। মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)

৪। মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী

৫। মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (র)

৬। মাওলানা শায়খ আবদুল হাদী মক্কী (র)

৭। মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র)

৮। মাওলানা তানতাবী জাওহারী (র)

৯। মাওলানা সাইয়েদ কুতুব মিসরী (র)

১০। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

১১। মাওলানা করম শাহ (র)

১২। মাওলানা মুহাদ্দিস আহমদ রিযা খান সাহেব ব্রেলবী (র)

১৩। মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী (র) প্রমুখ।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের তাফসীর তথা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাফসীর শাস্ত্রের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাফসীর শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধানের উপর অগাধ জ্ঞানার্জন ব্যতীত আল-কুরআনের তাফসীর করা হতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে যেহেতু আল-কুরআন মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে গাইডবুক, সেহেতু এর মর্মার্থ ব্যক্তি জীবনে অনুধাবনসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। তাই এসব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসুর জন্য অপরিহার্য। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ করছি তিনি যেন আমাদেরকে আল কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করে তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করেন।

[প্রবন্ধটি বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের গবেষণা বিভাগের ২৯শে মার্চ, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ স্টাডি সেশনে পঠিত হয়। মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে প্রবন্ধটির মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন–

মাওলানা মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, মাওলানা খলিলুর রহমান আলমাদানী, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান, ড. মানজুরে ইলাহী প্রমুখ।]

তথ্যসূত্র

১.	ড. মুহাম্মাদ হোসাইন আয-যাহবী (র)	আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন	১ম খণ্ড –১৪
২.	হোসাইন ইবন মাসউদ বাগভী (র)	মা'আলেমুত তানযীল	১ম খণ্ড –০৩
৩.	কাযী নাছীরুদ্দীন বায়যাবী (র)	আল-আনওয়ারুত তানযীল ও আসরারুত তাবীল মুকাদ্দামা	১ম খণ্ড –০৩
৪.	কাযী নাছীরুদ্দীন বায়যাবী (র)	আল-আনওয়ারুত তানযীল ও আসরারুত তাবীল মুকাদ্দামা	১ম খণ্ড –০৩
৫.	আয-যারকানী (র)	মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন	পৃষ্ঠা –৪৭৩
৬.	শিহাবুদ্দীন আল-আলুসী (র)	রূহুল মা'আনী	১/২ খণ্ড –০৪
৭.	আয-যারকানী (র)	মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন	পৃষ্ঠা –৪৭৩
৮.	হোসাইন ইবন মাসউদ বাগভী (র)	মা'আলেমুত তানযীল	১ম খণ্ড –০৭
৯.	ড. মুহাম্মাদ হোসাইন আয-যাহবী (র)	আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন	১ম খণ্ড –১৮
১০.	মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র)	মা'আরেফুল কুরআন	১ম খণ্ড –৩৫
১১.	আল-কুরআনুল কারীম	সূরা আন-নাহল	আয়াত –৪৪
১২.	আল-কুরআনুল কারীম	সূরা আলে-ইমরান	আয়াত –১৬৪
১৩.	আল-কুরআনুল কারীম	সূরা আন-নিসা	আয়াত –১০৫
১৪.	আল-কুরআনুল কারীম	সূরা আন-নাহল	আয়াত –৬৪
১৫.	মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র)	মা'আরেফুল কুরআন	১ম খণ্ড –৩৬
১৬.	আল-কুরআনুল কারীম	সূরা আন-নিসা	আয়াত –৬৯
১৭.	মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র)	মা'আরেফুল কুরআন	১ম খণ্ড –৪০
১৮.	মুফতী আমীমুল ইহসান (র)	আত-তানভীর	পৃষ্ঠা –১১১
১৯.	জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র)	আল-ইতকান	১ম খণ্ড –৩৭৯-৪০০
২০.	অধ্যাপক গোলাম আযম	সহজ বাংলায় আল-কুরআনের অনুবাদ	১ম খণ্ড –৩৫,৩৬
২১.	জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র)	আল-ইতকান	২য় খণ্ড –৩৭২-৩৭৬
	ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহবী (র)	আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন	১ম খণ্ড –৬৩
২২.	জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র)	আল-ইতকান	২য় খণ্ড –৩৭৬-৩৭৭
	ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহবী (র)	আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন	১ম খণ্ড –১০১

ইল্‌মুল হাদীস

মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান

লেখক পরিচিতি

মোঃ আতিকুর রহমান ১৯৪৩ সালে নোয়াখালী জিলার বেগমগঞ্জ উপজিলার মিরওয়ারিশপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ রাশেদ (ফাযিলে দেওবন্দ), যিনি তৎকালীন সময়ে "বড় হুজুর" নামে সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও বুজর্গ ব্যক্তি হিসেবে সবার নিকট সুপরিচিত ছিলেন। আম্মার নাম বেগম জীনাতুন্নেসা। বর্তমানে তিনি ৭৪/১-এ, কল্যাণপুর, মিরপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি ১৯৫৯ সালে তাঁর আব্বার প্রতিষ্ঠিত মিরওয়ারিশপুর সিনিয়ার মাদরাসা থেকে দাখিল, ১৯৬৩, ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ সালে নোয়াখালী কারামাতিয়া আলীয়া মাদরাসা থেকে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। অতঃপর ১৯৬৯ সালে ঢাকার বুরহান উদ্দিন কলেজ থেকে এইচ.এস.সি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৪ সালে ইসলামিক স্টাডিজে বি.এ অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে তাঁকে ১৯৭২ সালে এক বছর কারাবরণ করতে হয়। ১৯৭৫ সালে ঢাকা সরকারী মাদরাসা-ই-আলীয়ায় অধ্যাপনার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৮১ সালে তিনি সউদী আরব গমন করেন এবং সেখানকার একটি ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক শাখায় 'ফরেন রিলেশনস অফিসার' হিসেবে একটানা ১৫ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং অনেক ফিচার ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি একজন সফল অনুবাদক। সহীহ আল বুখারী ও তাফসীর তাদাব্বুরে কুরআন-এর অনুবাদকমণ্ডলীর তিনি একজন। বর্তমানে তিনি ইসলাম প্রচার সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

ইসলামী জীবন বিধান তত্ত্ব ও তথ্যগতভাবে দু'টো মৌলিক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটি হচ্ছে পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন। অপরটি হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। পবিত্র কুরআন উপস্থাপন করেছে ইসলামের মূল কাঠামো আর রাসূলের হাদীস সেই কাঠামোর ওপর গড়ে তুলেছে একটি পূর্ণাঙ্গ ইমারত। তাই ইসলামী শরী'আতের উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। প্রকৃতপক্ষে হাদীস হচ্ছে কুরআন মজীদেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ। এ কারণে ইসলামী জীবন বিধানে পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি হাদীসের গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

"(আল্লাহর) রাসূল যা কিছু (অনুমতি) দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (আল-হাশর, আয়াত-৭)

পবিত্র কুরআনের অপর একটি ঘোষণানুযায়ী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও কর্মধারা মুসলমানদের জন্য "উসওয়ায়ি হাসানাহ্" বা সর্বোত্তম আদর্শ। মুসলমানদের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির সকল অংগনেই এ আদর্শের পরিধি বিস্তৃত। এ আদর্শের সঠিক ও নির্ভুল বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে। কাজেই প্রকৃত মুসলিমরূপে জীবন যাপন ও ঈমানের দাবী সর্বতোভাবে পূরণের জন্য হাদীসের ব্যাপকতর অধ্যয়ন ও তা অনুসরণ করা অতীব জরুরী। পবিত্র কুরআনে একথাটি এভাবে বলা হয়েছে :

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ.

"যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করলো বস্তুত সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।" (আন-নিসা, আয়াত-৮০)

যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা সম্ভব নয় সেহেতু হাদীসকে বাদ দিয়ে কুরআন অনুযায়ী আমল করাও অসম্ভব। সুতরাং যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বা হাদীসকে অস্বীকার করে প্রকারান্তরে তারা আল্লাহকেই

অস্বীকার করে। এ কারণেই দেখা যায়, ছাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত গোটা মুসলিম উম্মাহ পবিত্র কুরআনের পর হাদীসকে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ সৃষ্টি হয়নি।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানদের জীবনকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ইসলামকে একটি নিষ্প্রাণ ও স্থবির ধর্মে পরিণত করার হীন উদ্দেশ্যে হাদীসের প্রামাণিকতা, বিশুদ্ধতা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে একটা সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টির অপচেষ্টা চলে আসছে সুদীর্ঘকাল থেকে। মূলতঃ ইসলামের সোনালী যুগের অবসানের পর মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের উত্থানের মধ্য দিয়েই এই অপচেষ্টা শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে "কুরআন পন্থী"র মুখোশ পরে হাদীস অবিশ্বাসীদের একটি গোষ্ঠি বিভিন্ন সময়ে সুকৌশলে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই হীন প্রয়াস চালায়।

এমনকি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বর্তমানে আমাদের দেশেও হঠাৎ গজিয়ে উঠা দু'একজন স্ব-ঘোষিত চিন্তাবিদ ও নব্য গবেষক (!) হাদীসের সংকলন, লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে নানা অবান্তর প্রশ্ন তুলে এর প্রামাণিকতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুসলিম জনমনে নতুন করে বিভ্রান্তি ছড়াবার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মতে পবিত্র কুরআনই ইসলামী শরী'আতের একক ও একমাত্র উৎস। হাদীস নির্ভেজাল ও সন্দেহমুক্ত নয়, তাই একে ইসলামী শরী'আতের উৎস হিসেবে মেনে নেয়া যায় না। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, হাদীসকে অস্বীকার করে কুরআন অনুযায়ী আমল করা আদৌ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে বললো : 'لاتحدثون الا بالقرآن' (আপনি আমাদের নিকট কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণনা করবেন না)। তদুত্তরে তিনি লোকটিকে বললেন :

ارأيت لو وكلت انت واصحابك الى القرآن اكنت تجد فيه صلوة الظهر اربعًا وصلوة العصر اربعًا والمغرب ثلاثًا ؟

(তুমি কি ভেবে দেখেছ, তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে যদি শুধুমাত্র কুরআনের উপর নির্ভরশীল করে দেয়া হয়, তাহলে কি তুমি তাতে যুহরের চার

রাকা'আত, আসরের চার রাকা'আত ও মাগরিবের তিন রাকা'আত নামাযের উল্লেখ পাবে?)

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফার (র) নিম্নোক্ত উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য।

لولا السنة ما فهم احد منا القرآن.

(হাদীস না থাকলে আমাদের কেউই কুরআন বুঝতে সক্ষম হতাম না।)

আর হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটিও একটি প্রামাণ্য দলীল। الصحابة كلهم عدول। অর্থাৎ (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) ছাহাবাদের সবাই আদিল (এ ক্ষেত্রে তাদের কেউ কোনরূপ মিথ্যার আশ্রয় নেননি)।

সর্বশেষে বলবো, হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে যারা হাদীসকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখান, তাদের উচিত এ বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা। তাহলে তারা জানতে পারবেন, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ইমামগণ কতটা নিষ্ঠার সাথে গভীর গবেষণা ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করেছেন এবং সহীহ হাদীসকে য'ঈফ ও মাওযূ' হাদীস থেকে পৃথক করেছেন। বক্ষমান নিবন্ধে আমরা হাদীসের পরিচয় ও এর বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করবো। আশা করি হাদীস অধ্যয়নকারীগণ এ থেকে উপকৃত হবেন।

হাদীসের পরিচয়

হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ নতুন কথা, বাণী, সংবাদ, বর্ণনা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবী জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন বা অন্যের কোন কথা বা কাজের প্রতি মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন তাকে হাদীস বলে। অনুরূপভাবে ব্যাপক অর্থে ছাহাবা ও তাবে'ঈদের কথা, কাজ এবং সম্মতিকেও হাদীস নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য কেউ কেউ সাহাবা ও তাবে'ঈদের কথা, কাজ ও সম্মতিকে 'আছার' নামে অভিহিত করেছেন।

হাদীসের প্রকারভেদ

মুহাদ্দিসগণ হাদীসসমূহকে বাছাই করতে গিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে এর শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। প্রথমত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও সমর্থন-এর দিক থেকে হাদীসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন :

কাওলী, ফে'লী ও তাক্রীরী। কথা জাতীয় হাদীসকে কাওলী, কাজ সম্পর্কিত হাদীসকে ফে'লী এবং সম্মতিসূচক হাদীসকে তাক্রীরী হাদীস বলা হয়। এই তিন প্রকার হাদীসেরই আবার নিম্নরূপ শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। যেমন : মারফু', মাওকূফ ও মাক্তু'।

যে হাদীসের সনদ[১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে "হাদীসে মারফু'" বলে।

যে হাদীসের সনদ কোন ছাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যা ছাহাবীর হাদীস বলেই সাব্যস্ত হয়েছে তাকে "হাদীসে মাওকূফ" বলে।

যে হাদীসের সনদ কোন তাবে'ঈ পর্যন্ত পৌছেছে। অর্থাৎ যা তাবে'ঈর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে "হাদীসে মাক্তু" বলে।

ইমাম আহমদ, সুফইয়ান আস-সাওরী প্রমুখ মুতাকাদ্দিম (পূর্ববর্তী) মুহাদ্দিসগণের মতে হাদীস প্রধানতঃ দু'প্রকার : মাক্বূল (গ্রহণযোগ্য) যা সহীহ হাদীসরূপে গণ্য এবং মারদূদ (প্রত্যাখ্যানযোগ্য) যা য'ঈফ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আত্-তিরমিযী, ইমাম আন্-নাবাবী প্রমুখ মুতাআখ্খির (পরবর্তী) মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন : সহীহ, হাসান এবং য'ঈফ। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ 'হাসান' হাদীসকে য'ঈফ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ একে একটি স্বতন্ত্র প্রকার হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে ইমাম আত্-তিরমিযীই সর্বপ্রথম "হাসান" হাদীসের এই পরিভাষাটি চালু করেন। তাঁর পূর্বে হাদীস সহীহ এবং য'ঈফ এ দু'প্রকারেই বিভক্ত ছিলো। উপরোক্ত তিন প্রকার (সহীহ, হাসান ও য'ঈফ) হাদীসের অধীনে আরো বহু প্রকার হাদীস রয়েছে।[২] মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন দিক ও দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসকে অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েক প্রকার হাদীস এবং তার শর'ঈ মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীস প্রধানতঃ দু'প্রকার : মাক্বূল এবং মারদূদ। "মাকবূল" ঐ রিওয়ায়াতকে[৩] বলা হয় যার সনদে হাদীস গ্রহণযোগ্য

---

১. হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) পরম্পরাকে 'সনদ' বলে।
২. ইমাম আন্-নাবাবী ও আস্-সুয়ূতীর মতে পঁয়ষট্টি প্রকার হাদীস রয়েছে। আর আল-হাযিমী-এর মতে সর্বমোট প্রায় একশ' প্রকার হাদীস রয়েছে।
৩. হাদীস বা আছার বর্ণনা করাকে 'রিওয়ায়াত' বলে এবং যিনি বর্ণনা করেন তাকে 'রাবী' বলে।

হওয়ার শর্তাবলী পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। আর যে রিওয়ায়াতে ঐ শর্তাবলী পুরো মাত্রায় বিদ্যমান না থাকে তাকে "মারদূদ" বলা হয়।

মাকবূল হাদীসের প্রকারভেদ

মাকবূল হাদীস প্রধানত দু'প্রকার : সহীহ্ এবং হাসান। এর প্রত্যেকটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত। সুতরাং মাকবূল হাদীস সর্বমোট চার ভাগে বিভক্ত।

১। সহীহ্ লি-যাতিহী (صحيح لذاته)

২। হাসান লি-যাতিহী (حسن لذاته)

৩। সহীহ্ লি-গাইরিহী (صحيح لغيره)

৪। হাসান লি-গাইরিহী (حسن لغيره)

১. সহীহ্ লি-যাতিহী : ইলমে হাদীসের পরিভাষায় ঐ হাদীসকে "সহীহ্ লি-যাতিহী" বলা হয় যার সনদ মুত্তাসিল,[৪] প্রত্যেক রাবীই (বর্ণনাকারী) 'আদিল[৫] ও পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন[৬] এবং হাদীসটি শায্ও নয়, মু'আল্লালও[৭] নয়। ফিক্হবিদ, উছূলবিদ এবং মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত অভিমত হলো, সহীহ্ হাদীস শরী'আতের নির্ভরযোগ্য দলীল এবং এর উপর আমল করা ওয়াজিব। সহীহ্ হাদীসের উদাহরণ হলো সহীহ্ বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীসটি :

عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه سمعت رسول الله (ص) قرأ فى المغرب بالطور.

"জুবাইর ইব্ন মুত'ইম তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন,

---

৪. 'সনদ মুত্তাসিল' অর্থ সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকা এবং কোনো স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ না পড়া।

৫. যে ব্যক্তি 'আদালত' গুণসম্পন্ন তাকে 'আদল' বা 'আদিল' বলে। অর্থাৎ যিনি হাদীস সম্পর্কে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। কিংবা সাধারণ কাজ-কারবারে বা কথাবার্তায় কখনো মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হননি। যিনি অজ্ঞাত-অপরিচিতও নন। অর্থাৎ দোষ-গুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা যায়নি এরূপ লোকও নন। যিনি ফাসিক কিংবা বিদ'আতীও নন তাকে আদল বা আদিল বলে।

৬. পূর্ণ স্মরণশক্তি বলতে বুঝায় যাদের স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ও প্রখর। যার মধ্যে বিবরণসমূহ পূর্ণ সতর্কতার সাথে স্মৃতিতে ধরে রাখার এমন ক্ষমতা আছে যে, প্রয়োজনবোধে তিনি পূর্ণ বিবরণটি হুবহু আবৃত্তি করতে পারেন। হাদীসের পরিভাষায় একে যাবৃত বলা হয়।

৭. 'শায' ও মু'আল্লাল হাদীস সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

শক্তিশালী সূত্রে বর্ণিত হয়। অর্থাৎ সহীহ হাদীসের কোন রাবীর মধ্যে যদি স্মরণশক্তির দুর্বলতা থাকে এবং অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে যদি তা দূরীভূত হয় তবে তাকে সহীহ লি-গাইরিহী বলা হয়। যেহেতু সনদ হিসেবে হাদীসটি সহীহ নয়, বরং অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সহযোগিতায় এটি সহীহ-এর মানে উন্নীত হয়েছে, তাই একে সহীহ লি-গাইরিহী বলা হয়। এর উদাহরণ তিরমিযীতে উল্লেখিত নিম্নোক্ত হাদীসটি :

عن ابى هريرة رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلوة.

"আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাযের সময়ই তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"

আল্লামা ইবনুস্ সালাহ-এর মতে এ হাদীসের অন্যতম রাবী মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আলকামা সৎ ও আমানতদার হওয়া সত্ত্বেও তিনি সিকাহ্[৯] রাবী নন। এমনকি কেউ কেউ তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতারও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের সমর্থনে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস একে সহীহ প্রমাণ করেছে। তাছাড়া আল-আ'রাজ সূত্রেও একটি সহীহ হাদীস এর সমর্থনে বর্ণিত হয়েছে। ফলে দুর্বলতা কেটে হাদীসটি সহীহ হাদীসের স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাই মুহাদ্দিসগণ ও উছূলবিদগণ এ শ্রেণীর হাদীসকেও সহীহ হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং একে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

৪. হাসান লি-গাইরিহী : যদি কোন য'ঈফ (দুর্বল) হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়ে বর্জনের স্তর হতে গ্রহণের মর্যাদা লাভ করে তখন তাকে হাসান লি-গাইরিহী বলা হয়। তবে হাদীসটির য'ঈফ হওয়ার কারণ রাবীর ফিস্‌ক বা মিথ্যাচার নয়। বরং রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা নতুবা সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া কিংবা রাবী মাজহূল (অপরিচিত) হওয়ার কারণে রিওয়ায়াতটিকে য'ঈফ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ শ্রেণীর হাদীস গ্রহণযোগ্য খবরে ওয়াহিদের অন্তর্ভুক্ত। একে দলীল হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হাসান লি-গাইরিহী-এর উদাহরণ :

---

৯. যে রাবীর মধ্যে 'আদালাত' (অর্থাৎ শরী'আতে নিষিদ্ধ এবং ভদ্রতা ও শালীনতা বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া) ও 'যাবৃত' (অর্থাৎ তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ও পূর্ণ সংরক্ষণ শক্তি) উভয় গুণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে তাকে 'সিকাহ' (নির্ভরযোগ্য) রাবী বলে।

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه ان امرأةً من بنى فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم ارضيـت مـن نفسـك ومـالك بنعلين؟ قالت نعم فاجاز.

'আবদুল্লাহ ইবন রাবী'আহ থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী ফাযারাহ গোত্রের জনৈকা মহিলা দু'টি জুতোর মাহরের বিনিময়ে বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি দু'টি জুতোর বিনিময়ে নিজেকে বিয়ে দিতে রাযী আছ? সে উত্তর দিল, হাঁ। তখন তিনি এ বিয়ের অনুমতি দিলেন।"

ইমাম আত-তিরমিযী (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পরে বলেছেন, হাদীসটির এক রাবী আসিম (র) তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে য'ঈফ হলেও এ রেওয়ায়াতটি অন্য অধ্যায়ে উমর (রা), আবু হুরাইরা (রা) এবং আয়িশা (রা) প্রমুখ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাই হাদীসটি হাসান।

রাবীগণের সংখ্যা হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ

হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা সব ক্ষেত্রে একই রূপ হয় না। রাবী বা বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হিসেবে হাদীস দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। মুতাওয়াতির (متواتر) এবং আহা-দ (احَادٌ) অর্থাৎ اَحَدٌ-এর বহুবচন।

❖ **মুতাওয়াতির :** হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় মুতাওয়াতির ঐ হাদীসকে বলা হয় যার সনদের প্রত্যেক স্তরেই বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা রচনা করা সাধারণত অসম্ভব বলে বিবেচিত হয় (অর্থাৎ কালের ব্যবধান, স্থানের দূরত্ব ও ভাষার পার্থক্য ইত্যাদি নানাবিধ কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এত বিপুল সংখ্যক লোকের কোন একটি মিথ্যা বিষয়ে একমত হওয়া সাধারণত অসম্ভব)। মুতাওয়াতির হাদীসের এ সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন রিওয়ায়াতই চারটি শর্ত পূরণ ব্যতীত 'মুতাওয়াতির'-এর
অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। শর্ত চারটি হলো :

(ক) রিওয়ায়াতটি বিপুল সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়া।

(খ) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সনদের সকল স্তরেই এই সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান থাকা।

(গ) রাবীগণের মিথ্যা বিষয়ে একমত হওয়া স্বভাবত অসম্ভব হওয়া।

(ঘ) রিওয়ায়াতটি ইন্দ্রিয় নির্ভর হওয়া। যেমন আমরা শুনেছি, আমরা দেখেছি ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বর্ণিত হওয়া।

মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা ইল্‌মে ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়, যা সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সনদ বিশ্লেষণ করা কিংবা বর্ণনাকারীদের সংখ্যা নির্ধারণের কোন প্রয়োজন নেই এবং বিনা আলোচনায়ই এর উপর আমল করা ওয়াজিব।

মুতাওয়াতির হাদীস আবার দু'প্রকার। লাফ্‌যী (لفظى) এবং মা'নাবী (معنوى)। মুতাওয়াতির লাফ্‌যী ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যার শব্দ ও ভাব একইরূপে সকল যুগে (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) বহু সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار.

"আমার ব্যাপারে যে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলবে অর্থাৎ মিথ্যা হাদীস রচনা করবে, সে যেন জাহান্নামে তার আশ্রয় স্থান বানিয়ে নেয়।" এ হাদীসটি মুতাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসগণ একমত। কোন কোন বর্ণনা মতে প্রাথমিক স্তরে সত্তরের অধিক সাহাবী থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রত্যেক যুগেই এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েছে।

আর মুতাওয়াতির মা'নাবী ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যার শব্দ এক না হলেও মূল ভাব বা অর্থটি সকল যুগেই অসংখ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমন : দু'আ করার সময় দু'হাত ওঠানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ দু'আয় কিভাবে হাত উঠিয়েছেন তার বর্ণনা একরূপ না হলেও তিনি যে দু'আয় হাত উঠিয়েছেন এ মূল অর্থটি সবাই বর্ণনা করেছেন। এ প্রসংগে প্রায় একশ'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার শব্দ এক না হলেও মর্মার্থ একই।

❖ **আহা-দ (احاد)** : এক বচনে আহাদ (احد)। এক ব্যক্তির রিওয়ায়াতকে খবরে ওয়াহিদ বলে। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় যে রিওয়ায়াত মুতাওয়াতির-এর শর্তে উত্তীর্ণ নয় (অর্থাৎ যে হাদীসের রাবীর সংখ্যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে পৌঁছেনি) তাকে আহা-দ বলে। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ইলমে নয্‌রী[১০] হাসিল হয়।

---

১০. ইল্‌মে নয্‌রী ঐ জ্ঞানকে বলা হয় যা দলীল-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। দলীল-প্রমাণ নির্ভরযোগ্য হলে তার উপর আমল করা ওয়াজিব।

অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিক্‌হবিদ ও উছূলবিদগণের মতে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবীর খবরে ওয়াহিদ শরী'আতের দলীল হিসেবে বিবেচিত এবং এর উপর আমল করা ওয়াজিব। তবে এর দ্বারা মুতাওয়াতির-এর ন্যায় নিশ্চিত জ্ঞান (ইল্‌মুল ইয়াকীন) হাসিল হয় না বরং যন্ (ظن)[১১] হাসিল হয়। এই শ্রেণীর হাদীস আবার তিন প্রকার :

মাশহূর (مشهور), আযীয (عزيز) ও গরীব (غريب)।

❖ **মাশহূর** : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদীস প্রত্যেক স্তরে তিনজন বা তার অধিক রাবী রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু রাবীগণের সংখ্যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে উপনীত হয়নি তাকে 'মাশহূর' বলে। অর্থাৎ রাবীর সংখ্যা কম হলেও হাদীসটি ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণে একে 'মাশহূর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ফকীহগণের পরিভাষায় একে 'মুস্তাফিয' (مستفيض) বলা হয়। উছূলবিদগণ মাশহূরকে মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহিদের মাঝামাঝি পৃথক এক প্রকার হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে এটি প্রথম যুগে খবরে ওয়াহিদের স্তরে ছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগে এসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মাশহূর হাদীসের উদাহরণ :

قال رسول الله (ص) ان الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء... الحديث ـ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বান্দাহদের নিকট থেকে সরাসরি ইল্‌ম ছিনিয়ে নেবেন না, বরং আলিমগণকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম তুলে নেবেন।" এ হাদীসের রাবীর সংখ্যা সকল স্তরেই দু'য়ের অধিক ছিল।[১২] কোন হাদীস মাশহূর হিসেবে প্রমাণিত হলে তা মর্যাদার দিক থেকে মুতাওয়াতির-এর নিম্নে এবং আযীয ও গরীবের ওপর স্থান পাবে।

---

১১. আরবীতে "যন্" (ظن) অর্থ প্রবল ধারণা, অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না, তবে বিশ্বাসের পাল্লা ভারী হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যে "যন্" (ধারণা) লাভ হয়ে থাকে, তা ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি শক্ত অবস্থারই নাম। 'ওয়াহাম' (وهم) বা 'শক' (شك)-এর নাম নয়। তাই বলা যায়, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যন্ অর্থাৎ ইয়াকীনই লাভ হয়, তবে মুতাওয়াতির-এর ন্যায় ইয়াকীন নয়।

১২. ইমাম আল বুখারী, মুসলিম, আত্‌তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ প্রমুখ এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

❖ **আযীয** : আভিধানিকভাবে (عزيـز) এর দু'টি অর্থ রয়েছে। এক. স্বল্প ও বিরল। যেহেতু এ ধরনের হাদীসের অস্তিত্ব খুব কম তাই একে 'আযীয' বলা হয়। দুই. মযবুত ও শক্তিশালী। অপর একটি সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা এর শক্তি সঞ্চয় হয় বলে একে আযীয বলা হয়ে থাকে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় ঐ হাদীসকে আযীয বলা হয় যার সনদের সর্বস্তরে কমপক্ষে দু'জন রাবী বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ সনদের কোন স্তরে তিন বা ততোধিক রাবী থাকলেও তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু শর্ত হলো সনদের প্রতিটি স্তরে কমপক্ষে দু'জন রাবী থাকতে হবে। হাফিয ইবনে হাজার আল আসকালানীর মতে 'খবরে **আযীয**'-এর এ সংজ্ঞাটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এর উদাহরণ নিম্নোক্ত হাদীসটি :

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.

"তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল লোকের চেয়ে অধিকতর প্রিয় না হই।"

যেহেতু তাবে'ঈগণের স্তরে শুধু দু'জন রাবী অর্থাৎ কাতাদাহ (র) ও আবদুল আযীয (র) এ হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন, তাই একে আযীয বলা হয়েছে।

❖ **গরীব** : গরীব (غريب) শব্দের অর্থ অপরিচিত, নিঃসংগ, আপনজন থেকে দূরে অবস্থানকারী ইত্যাদি।

হাদীসের পরিভাষায় গরীব ঐ 'খবর'কে বলা হয় যার কোন এক স্তরে শুধু একজন রাবী রয়েছেন। তবে সনদের কোন কোন স্তরে একাধিক রাবী বিদ্যমান থাকলেও তাতে কোন দোষ নেই।

খবরে গরীব দু'ভাগে বিভক্ত। গরীবে মুত্‌লাক ও গরীবে নিস্‌বী। যদি কোন হাদীসের মূল সনদে (অর্থাৎ ছাহাবীগণের স্তরে) রাবী একজন হয় তবে তাকে গরীবে মুত্‌লাক বা ফরদে মুত্‌লাক বলা হয়। এর উদাহরণ সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এ হাদীসটি : انما الاعمال بالنيات... الخ

"সকল কাজের সফলতা নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল...।"

যদি কোন রিওয়ায়াতের মধ্য সনদে অর্থাৎ ছাহাবীগণের পরবর্তী স্তরে রাবী একজন হয় তবে তাকে গরীবে নিস্‌বী বলে। এর উদাহরণ সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর এ হাদীসটি :

عن انس (رض)ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر.

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করার সময় তাঁর মাথায় মিগ্‌ফার (লৌহ নির্মিত টুপী) ছিল।' আনাস (রা) থেকে এ হাদীসটি শুধু ইমাম আয্‌-যুহ্‌রী এবং ইমাম আয্‌-যুহ্‌রী থেকে শুধু ইমাম মালিক রিওয়ায়াত করেছেন।

এছাড়া মুহাদ্দিসগণ গরীব হাদীসকে আরো বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। ইল্‌মে হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুসনাদুল বায্‌যার এবং আল-মু'জামুল আওসাত লিত্‌-তাবারানী গ্রন্থে এর অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মাক্‌বূল (গ্রহণযোগ্য) হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ নিম্নলিখিত শব্দাবলী ব্যবহার করে থাকেন যদ্বারা হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে চিহ্নিত করা সহজ হয়। যেমন : জাইয়্যিদ (جيد), মুজাওয়াদ (مجود), কাবী (قوى), সাবিত (ثابت), মাহফূয (محفوظ), মা'রূফ (معروف), সালিহ (صالح), মুস্‌তাহ্‌সান (مستحسن), হাসান (حسن), সহীহ (صحيح), রিজালুহু সিকাত (رجاله ثقات), রিজালুহু মাওসূকূন (رجاله موثوقون), রিজালুহু রিজালুস্‌ সহীহাইন (رجاله رجال الصحيحين) প্রভৃতি।

য'ঈফ হাদীসের প্রকারভেদ

মুহাদ্দিসগণ য'ঈফ হাদীসকে বহু প্রকারে বিভক্ত করেছেন। ইবনে হিব্বান প্রায় পঞ্চাশ শ্রেণীতে য'ঈফ হাদীসকে বিভক্ত করেছেন। হাদীস য'ঈফ হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তবে এর মধ্যে মৌলিক কারণ দু'টি। ১. সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া, ২. রাবী অভিযুক্ত অর্থাৎ দোষী সাব্যস্ত হওয়া।

য'ঈফ (ضعيف) শব্দটি আল-কাবী (القوى) অর্থাৎ শক্তিশালী-এর বিপরীতার্থক শব্দ। এর অর্থ দুর্বল। এ দুর্বলতা দু'ধরনের হতে পারে– ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অর্থগত। হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দ্বারা অর্থগত দুর্বলতা বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণেই কোন হাদীসকে দুর্বল বা য'ঈফ বলা হয়। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথাই য'ঈফ নয়। য'ঈফ হাদীসের পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনুস্‌ সালাহ (র) বলেন : য'ঈফ ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যাতে সহীহ অথবা হাসান হাদীসের শর্তসমূহ অনুপস্থিত।

আল্লামা ইবনে দাকীকুল-ঈদ-এর মতে য'ঈফ ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যা

হাসান হাদীসের শর্তাবলীর কোন একটি বাদ পড়ার কারণে হাসান-এর স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। আল্লামা বাইকুনী (র) তার 'মানযূমাত' গ্রন্থে লিখেছেন, হাসান হাদীস-এর নিম্নস্তরের রিওয়ায়াতকে য'ঈফ বলা হয়। য'ঈফ হাদীসের উদাহরণ এ হাদীসটি :

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا او امرأة فى دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد.

"যে হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে অথবা পেছন দ্বার দিয়ে স্ত্রী-সঙ্গম করে কিংবা (অদৃশ্য বিষয় জানার জন্য) গণকের কাছে যায় (বা অদৃশ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করে অর্থাৎ গণক), সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীকে অস্বীকার করলো।"

এ হাদীসের সনদে আল্‌-আসরাম নামে জনৈক রাবী রয়েছেন। ইমাম বুখারী (র) ও ইবনে হাজার (র) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁকে দুর্বল বলেছেন।

মুহাদ্দিসগণের মতে জাল (মিথ্যা) হাদীস ব্যতীত সকল প্রকার য'ঈফ হাদীসই সনদের দুর্বলতা ও দোষ-ক্রটি বর্ণনা ব্যতীত রিওয়ায়াত করা জায়েয। তবে শর্ত হলো, হাদীসটি দীনী আকীদা (যেমন আল্লাহ তা'আলার সিফাত) এবং শরী'আতের বিধান (যেমন হালাল-হারাম) সম্পর্কিত হবে না। অর্থাৎ ওয়ায-নসীহত, ভাল কাজে উৎসাহ প্রদান, মন্দ কাজে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং কিস্‌সা-কাহিনী বর্ণনাসহ ফাযাইলে আ'মালের ক্ষেত্রে য'ঈফ হাদীস বর্ণনা করা জায়েয।

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সুফ্‌ইয়ান আস্‌-সাওরী, ইবনুল মাহ্‌দী এবং আহমদ ইব্‌নে হাম্বল প্রমুখ য'ঈফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সনদ উল্লেখ না করে য'ঈফ হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেছেন : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا) না বলে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।" (روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) এরূপ বাক্যে বর্ণনা করা উচিত।

য'ঈফ হাদীসের উপর আমল করার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত হচ্ছে : সাধারণভাবে য'ঈফ হাদীসের ওপর আমল করা জায়েয। তিনি য'ঈফ হাদীসকে ব্যক্তিগত রায় বা কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দিতেন। যেমন 'নামাযের মধ্যে

অট্টহাসি দিলে উযূ নষ্ট হয়ে যায়।' সর্বসম্মতিক্রমে এ হাদীসটি য'ঈফ। এটা কিয়াস বিরোধীও বটে। কেননা হাসি উযূ ভঙ্গের কারণ নয়। কিন্তু এ বিষয়ে যেহেতু একটি য'ঈফ হাদীস রয়েছে, তাই তিনি কিয়াসের উপর য'ঈফ হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে তার ওপর আমল করেছেন। আর ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মা'ঈন, ইমাম আল বুখারী, মুসলিম ও ইবনুল আরাবী (র) প্রমুখের অভিমত হচ্ছে : সাধারণভাবে য'ঈফ হাদীসের ওপর আমল করা জায়েয নয়। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে ফাযাইলে আ'মালের ক্ষেত্রে য'ঈফ হাদীসের ওপর আমল করা মুস্তাহাব। ইবনে হাজার আল আসকালানী (র)-এর বর্ণনানুযায়ী শর্ত তিনটি হচ্ছে :

১. হাদীসটি অত্যধিক দুর্বল হবে না, ২. হাদীসটি আমল উপযোগী হবে এবং তা শরী'আতের বিধি-বিধান ও মূলনীতির পরিপন্থী হবে না, এবং ৩. হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, বরং সতর্কতার সাথে তার ওপর আমল করতে হবে। এ বিষয়ের ওপর ইবনে হিব্বান রচিত 'কিতাবুয্ যু'আফা' এবং ইমাম আয্-যাহাবী (র) রচিত 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হাদীস য'ঈফ হওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে মৌলিক কারণ দু'টি। (১) সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া অর্থাৎ সনদের ধারাবাহিকতা থেকে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়া, (২) রাবী অভিযুক্ত অর্থাৎ দোষযুক্ত সাব্যস্ত হওয়া।

সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে য'ঈফ হাদীসের কয়েকটি প্রকারভেদ

❖ **আল-মু'আল্লাক** (المعلق) : মু'আল্লাক শব্দের অর্থ ঝুলন্ত বস্তু। এ সনদকে মু'আল্লাক এজন্য বলা হয় যে, এর উপরের অংশ শুধু মুত্তাসিল থাকে আর নিচের অংশ থাকে বিচ্ছিন্ন। হাদীসের পরিভাষায় সনদের শুরু থেকে পর পর এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়াকে মু'আল্লাক বলা হয়। যেমন, সনদের সকল রাবীর নাম বিলুপ্ত করে (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا) 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন' এরূপ বলে হাদীস বর্ণনা করা। অথবা শুধু ছাহাবী কিংবা ছাহাবী ও তাবে'ঈর নাম রেখে সনদের অন্যান্য রাবীগণের নাম বিলুপ্ত করে হাদীস রিওয়ায়াত করা। এর উদাহরণ সহীহ আল বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীসটি :

وقال ابو موسى غطى النبى صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضى الله عنه.

“আবু মূসা আশ‘আরী (রা) বলেন, উসমান (রা) যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাঁর দুই হাঁটু ঢেকে ফেললেন।”

এ হাদীসটি মু‘আল্লাক। কেননা ইমাম আল বুখারী ছাহাবী আবু মূসা আশ‘আরী ব্যতীত অন্য কোন রাবীর নাম উল্লেখ করেননি।

মু‘আল্লাক হাদীস সাধারণত মারদূদ হাদীসের মধ্যে গণ্য। কেননা এর সনদ মুত্তাসিল নয়। অর্থাৎ সনদ থেকে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়েছে। আর বাদ পড়ার কারণে তাঁদের অবস্থাও অজ্ঞাত থাকে। তবে অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হলে তা সহীহ বলে গণ্য হবে। আর যেসব গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীস সংকলনের শর্তারোপ করা হয়েছে (যেমন সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) সেসব গ্রন্থে যদি দৃঢ়তাসূচক শব্দ যেমন– قال (তিনি বলেছেন), فعل (তিনি করেছেন) প্রয়োগে হাদীস বর্ণনা করা হয় তবে তাও সহীহ বলে গণ্য হবে। আর দুর্বল শব্দে বর্ণনা করা হলে (যেমন قيل ‘বলা হয়েছে’, روى ‘বর্ণিত হয়েছে’ ইত্যাদি) সেক্ষেত্রে হাদীসটি সহীহ, হাসান অথবা য‘ঈফ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে মাওযূ‘ নয়। (এখানে প্রসংগত উল্লেখ করা দরকার যে, মুহাদ্দিসগণ গবেষণা করে দেখেছেন, সহীহ আল বুখারীর মু‘আল্লাক হাদীসসমূহের সনদও মুত্তাসিল।)

❖ **আল-মুরসাল (المرسل)** : ‘আল-মুরসাল’-এর আভিধানিক অর্থ ছেড়ে দেয়া, বাদ পড়া ইত্যাদি। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীসের সনদের শেষাংশ থেকে তাবে‘ঈর পরে সাহাবী বাদ পড়াকে ‘আল-মুরসাল’ বলে। যেমন, কোন তাবে‘ঈর উক্তি : “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেছেন, কিংবা এরূপ করেছেন অথবা তাঁর সামনে এরূপ করা হয়েছে” ইত্যাদি। এর উদাহরণ সহীহ মুসলিম-এর এ হাদীসটি :

عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

“সা‘ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানাহ (বৃক্ষের তরতাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে অথবা গাছে থাকা ফলের সাথে মাটিতে রাখা ফল বিক্রয় করা)

পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। হাদীসের রাবী সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব একজন বয়োজ্যেষ্ঠ তাবে'ঈ। তাঁর আগে ছাহাবীর নাম বাদ পড়েছে বিধায় হাদীসটি মুরসাল।

কতিপয় মুহাদ্দিস, ফিক্‌হবিদ ও উছূলবিদের মতে মুরসাল হাদীস য'ঈফ এবং তা শরী'আতের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বাদ পড়া রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত। তাছাড়া তিনি সাহাবী না হয়ে একজন তাবে'ঈও হতে পারেন। তবে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী মুরসাল হাদীস সহীহ এবং তা শরী'আতের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হলো, তাবে'ঈ রাবীকে সিকাহ হতে হবে। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, একজন সিকাহ্ তাবে'ঈ অপর একজন সিকাহ্ রাবী থেকে শ্রবণ না করে কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কোন হাদীস বর্ণনা করতে পারেন না। ইমাম শাফে'ঈ ও কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে 'মুরসাল' হাদীস গ্রহণযোগ্য। যেমন : (ক) বর্ণনাকারী তাবে'ঈ বয়োজ্যেষ্ঠ হতে হবে। (খ) সিকাহ্ রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করতে হবে। (গ) রিওয়ায়াতটি সিকাহ্ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হবে না ইত্যাদি।

❖ **আল-মু'দাল** (المعضل) 'মু'দাল'-এর আভিধানিক অর্থ দুর্বল, শক্তিহীন ইত্যাদি। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় সনদ থেকে পর পর দু'জন অথবা ততোধিক রাবী বাদ পড়াকে 'আল্-মু'দাল' বলে। এর উদাহরণ হলো নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি :

عن مالك انه بلغه ان ابا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل الا ما يطيق.

"ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট এ মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বলেছেন : দাস-দাসীকে উত্তম খাবার ও পোশাক দেয়া উচিত। যে কাজ করতে তারা সক্ষম নয় সে কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়।"

এ হাদীসটিতে ইমাম মালিক (র) ও আবু হুরাইরা (রা)-এর মাঝখান থেকে পর পর দু'জন রাবী (মুহাম্মাদ ইবনে আজ্‌লান ও তাঁর পিতা) বাদ পড়েছেন। মুওয়াত্তা ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে হাদীসটির সনদ বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

عن مالك عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابى هريرة الخ

মু'দাল হাদীসও য'ঈফ। সনদ থেকে একাধিক রাবী বিলুপ্ত হওয়ার কারণে এর মর্যাদা মুরসাল ও মুনকাতি' থেকেও নিম্নে। এটা মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত অভিমত।

❖ **আল্‌-মুনকাতি' (المنقطع)** : আল-মুনকাতি'-এর আভিধানিক অর্থ বিচ্ছিন্ন। হাদীসের পরিভাষায় সনদের যে কোন অংশ অর্থাৎ প্রথমাংশ কিংবা শেষাংশ অথবা মধ্যমাংশ থেকে রাবী বিলুপ্ত হওয়াকে আল্‌-মুনকাতি' বলা হয়। খতীব আল-বাগদাদী, ইবনু আবদিল বার প্রমুখ মুহাদ্দিস এবং ফকীহগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ সংজ্ঞানুযায়ী মুরসাল, মু'আল্লাক এবং মু'দাল সবই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তী (মুতাআখ্‌খির) মুহাদ্দিসগণ যেমন : ইমাম নাবাবী প্রমুখ মুনকাতি'কে এমন একটি বিশেষ অর্থে সংজ্ঞায়িত করেছেন যা মুরসাল, মু'আল্লাক ও মু'দাল থেকে ভিন্নতর। তাঁদের মতে মুনকাতি' বলা হয় ঐ হাদীসকে যার সনদ মুত্তাসিল নয় এবং তা মুরসাল, মু'আল্লাক কিংবা মু'দালও নয়। তাই আল্লামা হাফিয যাইনুদ্দীন ইরাকী বলেন, মুন্‌কাতি' ঐ হাদীসকে বলে যার সনদ থেকে ছাহাবীর পূর্বেকার শুধু এক স্থান থেকে একজন ছাহাবী রাবী বাদ পড়েছেন। কারো কারো মতে মুনকাতি' ঐ হাদীসকে বলা হয় যার সনদ থেকে পূর্বেকার এক বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্থান থেকে বাদ পড়েছেন। হাফিয ইবনে হাজার আল আসকালানীর (র) মতে সনদের বিভিন্ন স্থান থেকে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়াকে মুনকাতি' বলা হয়। মুনকাতি'-এর উদাহরণ নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি :

رواه عبد الرزاق عن الثورى عن ابى اسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا : ان وليتموها ابا بكر فقوى امين.

"যদি তোমরা আবু বকরের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ কর তবে সে তার যোগ্য আমানতদার।"

এ সনদে আস-সাওরী (র) এবং আবু ইসহাক (র)-এর মাঝ থেকে শুরাইক নামে জনৈক রাবী বাদ পড়েছে। কেননা আসসাওরী (র) সরাসরি আবু ইসহাক (র) থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। বরং তিনি শুনেছেন শুরাইক (র)-এর নিকট থেকে। আর শুরাইক (র) শুনেছেন আবু ইসহাক (র)-এর নিকট থেকে।

যেহেতু মুন্‌কাতি' হাদীস-এর সনদ মুত্তাসিল নয় এবং বিলুপ্ত রাবীর অবস্থা অজানা। তাই মুহাদ্দিসগণ একে য'ঈফ হিসেবে গণ্য করেছেন।

❖ **আল্‌-মুদাল্লাস (المدلس) :** হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় সনদের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে হাদীসের সৌন্দর্য প্রকাশ করাকে তাদলীস বলা হয়। আর এরূপ হাদীসকে বলে মুদাল্লাস। তাদলীস প্রধানতঃ দু'প্রকার। তাদলীসুল ইস্‌নাদ এবং তাদলীসুশ্‌ শুয়ূখ। মুহাদ্দিসগণ তাদলীসুল ইসনাদ-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তবে এর মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন আহ্‌মাদ ইবনে আমর আল্‌-বায্‌যার (র) এবং আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান (র)। তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি এই : যে উস্তাদের সাথে রাবীর সাক্ষাৎ ও শ্রবণ প্রমাণিত নয় এমন রাবীর এরূপ শব্দ (যেমন قال অথবা عن ইত্যাদি) প্রয়োগে কোন হাদীস বর্ণনা করা যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁর নিকট থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন, অথচ তিনি ঐ উস্তাদের কাছ থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি। অন্য কথায় এভাবে বলা যায়, যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম না করে উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই ঐ হাদীস উপরস্থ শায়খের নিকট শুনেছেন, অথচ তিনি নিজে তা তাঁর নিকট শুনেননি। এরূপ হাদীসকে 'হাদীসে মুদাল্লাস' বলে। যিনি এরূপ করেন তাকে বলে মুদাল্লিস।

আবার অনেক সময় রাবী তার শায়খকে অখ্যাত নাম বা উপনাম কিংবা বিশেষ বিশেষণ দ্বারা বর্ণনা করেন। ফলে তাঁকে চেনা যায় না। এক ব্যক্তিকেই দু'ব্যক্তি বলে সন্দেহ জন্মে। এরূপ তাদলীসকে তাদলীসুশ্‌ শুয়ূখ বলে। তাদলীসের প্রথমোক্ত প্রকারটি খুবই খারাপ ও নিন্দনীয়। আর দ্বিতীয় প্রকারটি খারাপ হলেও প্রথমটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।

অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিক্‌হবিদ ও উছূলবিদগণের মতে, সিকাহ রাবীর ঐ মুদাল্লাস রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য যাতে সুস্পষ্টভাবে শ্রবণ (سماع) অর্থাৎ حدثني অথবা سمعت ইত্যাদি শব্দে হাদীস রিওয়ায়াত করা প্রমাণিত হয়। 'আন্‌' (عن) দ্বারা বর্ণনা করলে মুদাল্লাস রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য কোন প্রবীণ রাবীর রিওয়ায়াত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন ইবনে উয়ায়নাহ প্রমুখ-এর রিওয়ায়াত। হানাফী আলিমগণের মতে মুদাল্লাস ও মুরসালের হুকুম একই। অর্থাৎ সিকাহ্‌ রাবীর মুরসাল রিওয়ায়াত যেমন গ্রহণযোগ্য, অনুরূপভাবে সিকাহ্‌ রাবীর মুদাল্লাস রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য।

❖ আল্‌-'আন্‌ 'আন ও আল্‌-মু'আন্‌'আন (العنعن والمعنعن) :

আল্‌-'আন্‌'আন : হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনার শব্দাবলী (যেমন সামি'তু, হাদ্দাসানী ও আখবারানী ইত্যাদি) উল্লেখ না করে ফুলান্‌ 'আন্‌ ফুলান্‌ (অমুক থেকে অমুক বর্ণনা করেছেন) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল্‌-'আন্‌'আন্‌ বলা হয়। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিক্‌হবিদ ও উছূলবিদগণের মতে তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে 'আন্‌-আন্‌' হাদীস মুত্তাসিল হিসেবে গণ্য হবে। শর্ত তিনটি হলো : রাবীর আদালত প্রমাণিত হওয়া, রাবী এবং তার শায়খের মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত হওয়া এবং হাদীসটি তাদলীস থেকে মুক্ত হওয়া।

আল্‌-মু'আন্‌'আন : পরিভাষায় 'হাদ্দাসানা ফুলানুন আন্না ফুলানান্‌ কালা" (حدثنا فلان ان فلانا قال) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল্‌-মু'আন্‌ 'আন (المعنعن) বলে। ইমাম মালিক (র)-এর মতে 'আন্‌'আন ও মু'আন্‌'আন হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম আহমদ (র) এবং আরো কতিপয় মুহাদ্দিস-এর মতে অন্য সূত্রের মাধ্যমে এর মুত্তাসিল হওয়া প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এটি মুন্‌কাতি' হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম বুখারী ও আলী ইবনুল মাদীনীসহ অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর মতে কেবলমাত্র উপরে উল্লেখিত তিনটি শর্ত পাওয়া গেলেই এটি মুত্তাসিল হিসেবে গণ্য হবে। কেননা মু'আন্‌'আন্‌ হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁরা শুধু পরস্পর সমসাময়িক যুগ হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি, বরং সমগ্র জীবনে অন্ততঃ একবার হলেও পারস্পরিক সাক্ষাতের শর্ত আরোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) মু'আন্‌'আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য শুধু সমসাময়িক যুগ হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। এ কারণেই সহীহ বুখারীর তুলনায় সহীহ মুসলিমে মু'আন্‌'আন্‌ হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশী।

য'ঈফ হাদীসের প্রকারভেদ (রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে)

রাবী অভিযুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে রাবীর যাব্‌ত (স্মৃতিশক্তি) ও আদালাত[১৩] ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা। রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণ দশটি। এর

---

১৩. যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও মুরুওয়াত (মনুষ্যত্ব) অবলম্বন করতে এবং মিথ্যা আচরণ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে 'আদালাত' বলে।

মধ্যে পাঁচটি যাব্‌ত[১৪]-এর সঙ্গে সম্পর্কিত, আর পাঁচটির সম্পর্ক আদালাতের[১৫] সংগে। এখানে প্রসংগত একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্মৃতিশক্তি বা যাব্‌ত দুর্বল হওয়ার কারণে রাবী অভিযুক্ত হওয়া এবং আদালাত-এর কারণে অভিযুক্ত হওয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো, রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে একটি হাদীস য'ঈফ হলেও অনুরূপ অর্থবোধক আরো কয়েকটি হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হলে এ দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে হাদীসটি শক্তিশালী হয়। কিন্তু আদালাতের কারণে কোন রাবী অভিযুক্ত হলে তাঁর বর্ণিত অপরাপর হাদীস কোন উপকারে আসে না। বরং তা আরো ক্ষতিকর হয় এবং তার বর্ণিত হাদীসকে আরো দুর্বল করে দেয়।

মুহাদ্দিসগণ রাবীর যাব্‌ত অর্থাৎ স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার দিক থেকে য'ঈফ হাদীসকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে প্রধান কয়েক প্রকার নিম্নরূপ :

❖ **আশ্‌-শায (الشاذ)** : শায-এর আভিধানিক অর্থ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, একাকী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। হাদীসের পরিভাষায় অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর রিওয়ায়াতের বিপরীতে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাবীর রিওয়ায়াতকে "আশ্‌-শায্‌" বলা হয়। আর অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর রিওয়ায়াতটিকে "আল-মাহ্‌ফুয" বলে। 'শায্‌' হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় তবে "মাহফুয" হাদীস গ্রহণযোগ্য। মুহাদ্দিসগণ 'আশ্‌-শায'-এর আরো কতিপয় সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন ইমাম শাফি'ঈর মতে কয়েকজন সিকাহ্‌ রাবীর বিপরীতে একজন সিকাহ্‌ রাবীর রিওয়ায়াতকে 'আশ-শায' বলে। হিজাযের অধিকাংশ আলিম এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন।

আবূ ইয়া'লী আল্‌-খলীলীর মতে একটি মাত্র সনদে বর্ণিত হাদীসকে 'আশ্‌শায' বলে। চাই এর রাবী সিকাহ্‌ হোক কিংবা গায়র সিকাহ। রাবী গায়র সিকাহ্‌ হলে হাদীসটি পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে। আর সিকাহ্‌ হলেও তা দলীল হিসেবে

---

১৪. 'যাব্‌ত'-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণগুলো হচ্ছে : (ক) রাবীর অধিক ভুল-ভ্রান্তি হওয়া, (খ) স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়া, (গ) অমনোযোগী হওয়া, (ঘ) অধিক সন্দেহ প্রবণ হওয়া, (ঙ) এবং সিকাহ রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করা।

১৫. 'আদালাত'-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণগুলো হচ্ছে : (ক) রাবীর মিথ্যা বলা, (খ) মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া, (গ) ফিস্‌ক তথা গুনাহ্‌র কাজ করা, (ঘ) বিদ'আতপন্থী হওয়া এবং (ঙ) রাবী মাজহুল বা অপরিচিত হওয়া।

গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে হাফিয ইবনে হাজার আল আসকালানীর মতে আশ্-শায-এর প্রথমোক্ত সংজ্ঞাটিই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। শায সনদের ন্যায় মতনেও[১৬] হতে পারে। 'আশ্-শায্'-এর উদাহরণ এ হাদীসটি :

ان رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولى هو اعتقه.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় এক ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার আযাদকৃত একটি গোলাম ছাড়া আর কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যায়নি।"

এ হাদীসটিকে সুফইয়ান ইবনে উয়ায়নাহ (র) আমর ইবনে দীনার (র) থেকে, তিনি আওসাজাহ-এর সূত্রে ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই একই হাদীসটিকে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ একই সনদে ইবনুল আব্বাস (রা)-এর নাম উল্লেখ না করে মুরসাল হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন। অথচ দু'জন রাবীই সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য। এমতাবস্থায় ইবনে উয়ায়নাহ্ (র)-এর রিওয়ায়াতটিকে এজন্য প্রাধান্য দেয়া হলো যে, তার সাথে ইবনে জুরাইজ প্রমুখও উক্ত হাদীসটিকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইবনে উয়ায়নাহ্-এর মুত্তাসিল রিওয়ায়াতটিকে 'মাহ্ফুয' এবং হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-এর মুরসাল রিওয়ায়াতটিকে 'শায' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

❖ **আল-মুনকার (المنكر)** : মুহাদ্দিসগণ মুনকার হাদীসের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন হাফিয ইবনে হাজার আল আসকালানী (র)। তাঁর মতে সিকাহ রাবীর বিপরীতে য'ঈফ রাবীর রিওয়ায়াতকে 'আল-মুনকার' বলে। আর বিপরীত রিওয়ায়াতটিকে বলা হয় "আল-মা'রূফ"।

কারো মতে কোন য'ঈফ রাবীর হাদীস অপর কোন য'ঈফ রাবীর হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত অধিক য'ঈফ রাবীর হাদীসকে হাদীসে মুনকার এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে হাদীসে মা'রূফ বলে। এরূপ হওয়াকে 'নাকারাত' বলে। 'নাকারাত' হাদীসের ক্ষেত্রে একটা বড় দোষ। মুনকার হাদীস সর্বনিম্ন পর্যায়ের য'ঈফ হাদীসের মধ্যে গণ্য। কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে মুনকার ঐ

১৬. সনদ বর্ণনা করার পর যে মূল হাদীসটি বর্ণনা করা হয় তাকে 'মতন' বলে।

হাদীসকে বলা হয় যার সনদে অধিক ভুল-ভ্রান্তিকারী রাবী কিংবা অমনোযোগী রাবী অথবা ফাসিক বা বিদ'আতী রাবী বিদ্যমান থাকে। এরূপ হাদীস কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হলেও তা শক্তিশালী হয় না। কেননা ফাসিক রাবীর সংখ্যা একাধিক হলেও তা কখনো সিকাহ্ রাবীর সমপর্যায়ের হতে পারে না। তবে কেউ কেউ এমন মতও প্রকাশ করেছেন যে, এর দ্বারা একটি হাদীস শক্তিশালী না হলেও এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটির ভিত্তি আছে। মুনকার-এর উদাহরণ এ রেওয়ায়াতটি :

رواه ابن ابى حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن ابى اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من اقام الصلاة واتى الزكوة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة.

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ছালাত কায়েম করলো, যাকাত আদায় করলো, বাইতুল্লাহর হজ্জ সম্পাদন করলো, ছাওম পালন করলো এবং মেহমানদারী করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

আবু হাতিম বলেন, এ রেওয়ায়াতটি মুনকার। কেননা অন্যান্য সিকাহ রাবীগণ আবূ ইসহাক থেকে মাওকূফ হিসেবে যে রিওয়ায়াত করেছেন, প্রকতৃপক্ষে তা মা'রূফ, কাজেই এ হাদীসটি মুনকার হবে।

❖ **আল-মুযতারাব (المضطرب)** : মূলতঃ এটি ইযতিরাবুল মাওজ (উত্তাল তরঙ্গ) থেকে উদ্গত। কোন কিছু এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল হয়ে যাওয়াকে আল-ইযতিরাব বলা হয়। হাদীসের পরিভাষায় 'আল-মুযতারাব' ঐ হাদীসকে বলা হয় যে হাদীসের রাবী হাদীসের 'মতন' বা 'সনদ'কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারে এমনভাবে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে হাদীসে এরূপ ইযতিরাব সংঘটিত হয়। সনদের ন্যায় মতনেও ইযতিরাব হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনদেই এরূপ হয়ে থাকে বেশী। যেমন : "হাদীসে কুল্লাতাইন" (حديث قلتين)। এ হাদীসের সনদে কারো মতে ওয়ালীদ ইবনে কাসীর (র)-এর উস্তাদের নাম মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর ইবনে যুবাইর। আবার কেউ বলেন, তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবনে উব্বাদ ইবনে জা'ফর। উপরন্তু তাঁর দাদা উস্তাদের নামেও গোলমাল রয়েছে। কারো মতে তাঁর নাম আবদুল্লাহ আবার কারো মতে উবায়দুল্লাহ। আর হাদীসের মতনের মধ্যেও গোলমাল রয়েছে। যেমন : কোন

হাদীসে قلتين আবার কোন হাদীসে قلتين وثلثا আবার কোন হাদীসে قلة বর্ণিত হয়েছে। মুয্‌তারাব হাদীস য'ঈফ হাদীসের মধ্যে গণ্য। মুযতারাব রিওয়ায়াতগুলোর পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হলে, অর্থাৎ কোন একটি রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দেয়া গেলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। নতুবা তাওয়াক্‌কুফ করতে হবে অর্থাৎ একে দলীল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

❖ **আল-মু'আল্লাল (المعلل)** : আল-মু'আল্লাল ঐ হাদীসকে বলা হয় যে হাদীসের সনদে এমন কোন সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান থাকে যা হাদীস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত যে কেউ উদঘাটন করতে সক্ষম নন। যেমন কোন রাবীর মাওসূল ও মারফূ' হাদীসকে নিজের সংশয় ও ভ্রমবশতঃ মুরসাল ও মাওকূফ হিসেবে রিওয়ায়াত করে দেয়া ইত্যাদি। এরূপ ত্রুটিকে বলে 'ইল্লত'। সনদ ও মতন উভয়ক্ষেত্রেই এটি হতে পারে। হাদীসের পক্ষে 'ইল্লত' একটি মারাত্মক দোষ। তাই মু'আল্লাল হাদীস সহীহ হতে পারে না।

❖ **আল-মুদরাজ (المدرج)** : যে হাদীসের মধ্যে রাবী তাঁর নিজের অথবা অপর কারো উক্তি সংযোজন করেছেন সে হাদীসকে 'হাদীসে মুদরাজ' বলে। আর এরূপ করাকে বলা হয় 'ইদ্‌রাজ'। ইদরাজ মতনেও হতে পারে আবার সনদেও হতে পারে। মতনে ইদরাজের উদাহরণ হলো সুফী সাবিত ইবনে মূসার এই বর্ণনাটি :

من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار.

"যে রাতের বেলা অধিক নামায পড়বে দিনে তার চেহারা উজ্জ্বল-আলোকময় হবে।"

প্রকৃত ঘটনা হলো, সাবিত ইবনে মূসা একদিন কাযী শুরাইক ইবনে আবদিল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন তিনি তার ছাত্রদেরকে হাদীস লিপিবদ্ধ করাচ্ছেন এবং বলছেন :

حدثنا الاعمش عن ابى سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

এতটুকু বলে তিনি চুপ রইলেন যাতে ছাত্ররা তা লিখে নিতে পারেন। এ সময় কাযী শুরাইক সাবিতের দিকে তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করে বললেন : من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. একথা দ্বারা কাযী সাহেবের উদ্দেশ্য ছিলো সাবিতের অধিক ইবাদাত-বন্দেগী ও তাকওয়ার প্রতি ইংগিত প্রদান করা। কিন্তু সাবিত এ উক্তিকে ঐ সনদের মতন মনে করে তা রিওয়ায়াত করতে থাকেন।

মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মতে ইচ্ছাপূর্বক হাদীসের মধ্যে ইদ্‌রাজ করা হারাম।

তবে হাদীসের কোন দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্যের অর্থ কিংবা ব্যাখ্যা প্রকাশার্থে যদি করা হয় এবং মুদ্‌রাজ বলে সহজে বুঝা যায় তবে তা হারাম হবে না। এ কারণে ইমাম আয্‌-যুহরী প্রমুখ মুহাদ্দিস এরূপ করেছেন।

❖ **আল-মাক্‌লূব (المقلوب)** : হাদীসের সনদে কিংবা মতনে কোন শব্দ রদ-বদল করে অথবা আগে-পরে উল্লেখের মাধ্যমে পরিবর্তন করাকে আল-মাক্‌লূব বলে। সনদের মধ্যে রাবীর নাম ও তাঁর পিতার নাম আগে-পরে উল্লেখ করাকে মাক্‌লূবুস্‌-সনদ বলা হয়। যেমন কা'ব ইবনে মুর্‌রাহ্‌-এর স্থলে মুর্‌রাহ্‌ ইবনে কা'ব এবং ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম-এর স্থলে মুসলিম ইবনে ওয়ালীদ-এর নামে হাদীস বর্ণনা করা ইত্যাদি। আর হাদীসের মতন পরিবর্তন করাকে 'মাক্‌লূবুল্‌ মতন' বলা হয়। এর দু'টি অবস্থা হতে পারে। প্রথমত যেমন : হাদীসের মতনের পূর্বের অংশকে পরে এবং পরের অংশকে পূর্বে উল্লেখ করা। এর উদাহরণ সহীহ মুসলিমের এ হাদীসটি "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই দিন তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তার ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবে না। এদের মধ্যে একজন হলো :

ورجل تصدق بصدقة اخفاها حتى لاتعلم يمينه ما تنفق شماله.

"ঐ ব্যক্তি, যে কিছু দান করে তা এমনভাবে গোপন রাখে যে, তার ডান হাতও জানে না তার বাম হাত কি খরচ করেছে।" আসলে হাদীসের মতন হবে এরূপ :

حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه.

"এমনকি তার বাম হাতও জানে না যে, তার ডান হাত কি খরচ করেছে।" কোন একজন রাবী হাদীসের শব্দ আগে-পরে উল্লেখ করে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

দ্বিতীয়ত একটি হাদীসের মতনের সাথে অপর একটি হাদীসের মতন ওলট-পালট করে রিওয়ায়াত করা। আর এটি সাধারণতঃ কাউকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

যেমন ড. মাহ্‌মুদ আত্‌-তাহ্‌হান মুসতালাহুল হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বাগদাদের অধিবাসীরা ইমাম বুখারী (র)-এর স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করার জন্য ১০০টি হাদীসের সনদ ও মতন ওলট-পালট করে তাঁর সামনে পেশ করেন। তিনি প্রত্যেকটি হাদীসেরই সনদ ও মতনের সঠিক অবস্থান বর্ণনা করে দেন এবং এক্ষেত্রে তিনি একটি ভুলও করেননি।

বিভিন্ন কারণে হাদীস মাক্‌লূব করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি হলো হাদীস রিওয়ায়াতে নতুন স্টাইল সংযোজন করে চমক সৃষ্টি করা, যাতে লোকেরা গভীর

আগ্রহের সাথে হাদীস গ্রহণ করে ও তার রিওয়ায়াত করে। এরূপ উদ্দেশ্যে মাক্‌লূব করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কেননা এতে হাদীসের মধ্যে রদ-বদল সংঘটিত হয়। আর এটা হলো মাওযূ' হাদীস রচনাকারীদের কাজ। আবার কখনো মুহাদ্দিসগণের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করার জন্য এরূপ করা হয়ে থাকে। এ ধরনের মাক্‌লূব করা জায়েয। তবে শর্ত হলো, মজলিস ভাঙ্গার পূর্বেই লোকদেরকে সঠিক তথ্য জানিয়ে দিতে হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির কারণেও এরূপ হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে এটি রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা বলে প্রমাণিত হবে এবং তিনি য'ঈফ রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

❖ **আল-মাতরূক (المتروك)** : আল-মাতরূক শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিত্যাজ্য। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদীসের রাবী হাদীস বর্ণনায় নয়, বরং সাধারণ কথাবার্তা বা কাজ-কারবারে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত বা খ্যাত হয়েছে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে 'আল-মাতরূক' বলে। কারো মতে, যে হাদীসের রাবী মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত আর শুধু ঐ একটি মাত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত এবং হাদীসটি শর'ঈ বিধানের পরিপন্থী– এরূপ হাদীসকে 'হাদীসে মাতরূক' বলে। এটি নিকৃষ্ট পর্যায়ের য'ঈফ হাদীসের মধ্যে গণ্য। এ ধরনের রাবীর সমস্ত হাদীস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি যদি খালেস তাওবা করেন এবং মিথ্যা পরিত্যাগ ও সত্যবাদিতার লক্ষণ তাঁর কাজ-কারবারে প্রকাশ পায় তবে পরবর্তীকালে বর্ণিত তাঁর হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।

❖ **আল-মাওযূ' (الموضوع)** : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় মনগড়া, বানানো মিথ্যা কথাকে স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে চালিয়ে দেয়াকে 'আল-মাওযূ' বলা হয়। অর্থাৎ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মিথ্যা রচনা করেছে বলে সাব্যস্ত হয়েছে তার হাদীসকে 'হাদীসে মাওযূ' (জাল হাদীস) বলে। এরূপ ব্যক্তির কোন হাদীসই কখনো গ্রহণযোগ্য নয়– যদিও সে অতঃপর খালেস তাওবা করে। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে এমন প্রত্যেক রিওয়ায়াতই মাওযূ' হিসেবে গণ্য হবে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে অথচ তিনি তা বলেননি বা অনুরূপ কাজ তিনি করেননি কিংবা অনুমোদন দেননি। চাই এ কাজটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে– কোন অবস্থায়ই মাওযূ' হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

ইল্‌মুল হাদীসের গ্রন্থে মাওযূ' (জাল) হাদীসকে য'ঈফ হাদীসের প্রকারের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে এবং একে সর্ব নিকৃষ্ট য'ঈফ হাদীস বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অবশ্য কোন কোন মুহাদ্দিস মাওযূ‘ হাদীসকে একটি পৃথক প্রকার হিসেবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ তারা একে য‘ঈফ হাদীসের প্রকারের মধ্যেও গণ্য করতে রাযী নন। কেননা কোন কারণে একটি হাদীস য‘ঈফ হলেও তা হাদীস হিসেবে গণ্য। কিন্তু মাওযূ‘ হাদীস মূলতঃ কোন হাদীসই নয়; বরং এটি মানুষের মনগড়া মিথ্যা কথা। মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কেউ ইচ্ছে করে মিথ্যা কথা বললে তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

“আমার সম্পর্কে ইচ্ছাপূর্বক কেউ কোন মিথ্যা কথা বললে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা খুঁজে নেয়।”

প্রচলিত কতিপয় মাওযূ‘ হাদীসের উদাহরণ :

علماء امتى كانبياء بني اسرائيل.

১. “আমার উম্মাতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের সমতুল্য।”

مداد العلماء افضل من دم الشهداء.

২. “আলিমগণের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও উত্তম।”

حب الوطن من الايمان.

৩.“স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।”

القلب بيت الرب.

৪. “কলব (অন্তর) হচ্ছে রবের ঘর।”

এরূপ শব্দে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে এর মর্ম সঠিক।

اطلبوا العلم ولو بالصين.

৫. “সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও ইলম হাসিল কর... ।”

صلوة بعمامة تعدل بخمس وعشرين وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة.

৬. “পাগড়ী পরিধান করে এক রাকা‘আত নামায পড়লে পঁচিশ রাকা‘আতের সমান সাওয়াব পাওয়া যায়। আর পাগড়ীসহ এক ওয়াক্ত জুমু‘আর নামায আদায় করলে সত্তর ওয়াক্ত জুমু‘আর সমান সাওয়াব পাওয়া যায়।”

❖ **আল-মুবহাম (المبهم)** : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি– যাতে তাঁর দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে– তাঁর হাদীসকে 'হাদীসে মুবহাম' বলে। এরূপ ব্যক্তি ছাহাবী না হলে তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

❖ **হাদীসে কুদ্‌সী (حديث قدسي)** : আরেক বিশেষ প্রকার হাদীস রয়েছে যাকে বলা হয় 'হাদীসে কুদসী।'

'কুদ্‌সী' শব্দটি কুদ্‌স (قدس) থেকে নিষ্পন্ন। এর আভিধানিক অর্থ পূত-পবিত্র, সাধুতা, পবিত্রতা ইত্যাদি।

পরিভাষায় 'হাদীসে কুদসী' ঐসব হাদীসকে বলা হয় যা বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এ ধরনের হাদীস বর্ণনার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : "আল্লাহ তা'আলা বলেছেন" কিংবা "জিবরাঈল (আ) বলে গেছেন।" অথবা "জিবরাঈলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন" বা "আমার প্রভু বলেছেন"।

হাদীসে কুদ্‌সীকে এ নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব হাদীসের বক্তব্য সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইল্‌কা, ইলহাম বা স্বপ্নযোগে লাভ করেছেন কিংবা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে লাভ করেছেন এবং তিনি নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন। কোন কোন মুহাদ্দিস বলেন, যেহেতু আল্লাহ তা'আলার একটি নাম "কুদ্দূস" আর হাদীসে কুদ্‌সীর মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহ পাকের বক্তব্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তাই একে হাদীসে কুদ্‌সী বলা হয়ে থাকে। হাদীসে কুদ্‌সীকে "হাদীসে এলাহী" এবং "হাদীসে রাব্বানী"ও বলা হয়ে থাকে। হাদীসে কুদ্‌সীর উদাহরণ সহীহ মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদীসটি :

عن ابى ذر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عزوجل : ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.

"আবূ যর (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন : হে আমার বান্দাগণ! আমি (আল্লাহ পাক) আমার নিজের ওপর যুল্‌ম-অত্যাচারকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও

যুল্‌ম-অত্যাচারকে হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা একে অন্যের ওপর যুল্‌ম করো না।"

এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, হাদীসের মানগত ও গুণগত পার্থক্যের যে বিবরণ উপরে আলোচনা করা হয়েছে তা মূলতঃ রাবী বা বর্ণনাকারীদের মানগত ও গুণগত পার্থক্যের কারণে। বস্তুতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন বাণীই গুণগত দিক থেকে দুর্বল কিংবা অগ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

উপসংহার

উপসংহারে বলতে চাই, কুরআন ও হাদীস হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের মূল ভিত্তি। কুরআন পেশ করেছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক নীতি আর হাদীস থেকে পাওয়া যায় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কুরআনী মূলনীতি বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পবিত্র কুরআন যেনো হৃদপিণ্ড তুল্য আর হাদীস এ হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে অনুরূপভাবে তা পেশ করে বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র জীবনধারা, কর্মনীতি ও আদর্শ। জানিয়ে দেয় তাঁর কথা, কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। তাই পবিত্র কুরআনের পর হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অতএব প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য প্রয়োজন পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের সাথে সাথে হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং তার আলোকে জীবন ও সমাজকে গড়ে তোলা। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

وما توفيقى الا بالله

তথ্যপঞ্জি :

❖ উলূমুল হাদীস : ড. সুবহী আস্‌-সালিহ্
❖ আন নাহ্‌জুল হাদীস : ড. আলী মুহাম্মাদ নাসার
❖ আল্‌-মুকাদ্দামাতু লি-মিশকাতুল মাসাবীহ্‌ : আবদুল হক আদ্‌দিহলাবী
❖ মীযানুল আখবার : সাইয়েদ মুফতী আমীমুল ইহ্‌সান
❖ হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস : মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী
❖ ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
❖ মুসতালাহুল হাদীস : ড. মাহ্‌মূদ আত্‌তাহ্‌হান
❖ নুখবাতুল ফিকার : হাফেয ইব্‌নে হাজার আল্‌-আসকালানী
❖ তারীখে ইল্‌মে হাদীস : মুফতী আমীমুল ইহ্‌সান
❖ তাদরীবুর রাবী : আবদুর রহমান আস্‌-সুয়ূতী
❖ রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত : ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন

[প্রবন্ধটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের গবেষণা বিভাগের ১১ই জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ স্টাডি সেশনে পঠিত হয়। মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে প্রবন্ধটির মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন–

ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান, মাওলানা রাফিকুর রাহমান, মাওলানা মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ এবং মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল্লাহ।]

ইল্‌মুল ফিক্‌হ

ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান

লেখক পরিচিতি

ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান ১৯৬২ সালের জুন মাসে বরিশাল জিলার গৌরনদী উপজিলার পিঙ্গলাকাঠী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম মরহুম কারী ইসহাক কবিরাজ। আম্মার নাম জবেদা খাতুন। বর্তমানে তিনি ১০৬৫ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর, ঢাকায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। শৈশবে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত কালনা প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে নিকটবর্তী কাসেমাবাদ আলীয়া মাদরাসা থেকে দাখিল, আলিম ও ফাযিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর সরকারী গৌরনদী কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা আলীয়া মাদরাসা থেকে কামিল (হাদীস) ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮১ সালে সউদী আরবস্থ "ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়" থেকে শিক্ষাবৃত্তি লাভ করে রিয়াদস্থ "মা'হাদ তা'লিমুল্ লুগাহ্ আল-'আরাবিয়া" থেকে আরবী ভাষায় ডিপ্লোমা ও মদীনা মুনাওয়ারাস্থ মা'হাদুল আ'লী লিদ্দাওয়া আল-ইসলামিয়া" থেকে "ইসলামিক দা'ওয়া ও সাংবাদিকতা" বিভাগে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক আরবী সাহিত্যে এম.এ ২য় স্থান ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ এম.এ ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। গাজীপুরস্থ দুর্বাটি আলীয়া মাদরাসা থেকে ১৯৯৮ সালে (তাফসীর গ্রুপে) কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৪ সালে "ইসলামে জিহাদের বিধান" শীর্ষক শিরোনামে আরবী বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীকের তত্ত্বাবধানে (পি.এইচ.ডি) ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ছাত্র জীবনে ইসলামী দাওয়াতী কাজের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। বর্তমানেও তিনি ইসলামী দাওয়া কাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।

রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামীর ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে অনুবাদক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে সউদী দূতাবাসে কিছুদিন কাজ করার পর সউদী আরবস্থ "আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থার ঢাকাস্থ অফিসে ইয়াতিম-প্রতিপালন বিভাগের পরিচালক হিসেবে সাত বছর ও কুয়েতী সহযোগিতায় পরিচালিত সোসাইটি অব সোস্যাল রিফর্ম ঢাকাস্থ সংস্থার শিক্ষা বিভাগের পরিচালক হিসেবে সাত বছর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর ক্যাম্পাসে আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন।

এছাড়াও তিনি "ফাত্হুল বারী অনুবাদ প্রকল্পের" অধীনে বিখ্যাত "ফাত্হুল বারী" গ্রন্থের অনুবাদ কাজে রত থাকার পাশাপাশি "ইসলামী বিচার ব্যবস্থার" একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ (৭/৮ খণ্ডে সমাপ্য) রচনার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

তাঁর লিখিত মূল্যবান প্রবন্ধ মাসিক পৃথিবীসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ভূমিকা

ইসলাম মহান আল্লাহ প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত মানব জাতির জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ শান্তিপূর্ণ জীবন বিধান। এতে মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের যাবতীয় সুন্দরতম সমাধান নিহিত রয়েছে। ইসলামের প্রধান উৎস পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ। আর এ কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক বিধানগুলোর সমসাময়িক পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে স্থান-কাল-পাত্রভেদে বাস্তব অবস্থার আলোকে প্রায়োগিক রূপ দিয়েছে যে শাস্ত্র, তার নাম হলো "ইল্‌মুল ফিক্‌হ।"

"ফিক্‌হ" শব্দের অর্থ কোন কিছু উপলব্ধি করা, অবগত হওয়া, অনুধাবন করা, সূক্ষ্মদর্শিতা, উন্মুক্ত করা ইত্যাদি। সত্যপন্থী মুজ্‌তাহিদগণ নিজ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সাহায্যে আন্তরিক ও একনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য যে জীবন প্রণালী ও বিধি বিধান পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্ভাবন করেছেন, সেগুলোর সমষ্টিই হলো "ইল্‌মুল ফিক্‌হ" বা "ফিক্‌হ শাস্ত্র।"

আরবী ভাষায় "ইল্‌মুল ফিক্‌হ" ও "ইলমু উছূলিল ফিক্‌হ" এর উপর পর্যাপ্ত গ্রন্থাদি বর্তমান থাকলেও বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের জন্য এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন গ্রন্থ নেই বললেই চলে। একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলামের মূল উৎস সম্পর্কিত আলোচনার শাস্ত্র "ইলমুল ফিক্‌হ" এর প্রয়োজনীয় দাবি পূরণের চেষ্টাই বর্তমান প্রবন্ধ "ইল্‌মুল ফিক্‌হ" লিখায় আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে।

علم الفقه হলো এমন শাস্ত্র "যার মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী শরী'আতের বিধি বিধান তার উৎসসমূহ থেকে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের দ্বারা জানা যায়।"[১]

আর علم اصول الفقه হলো "এমন শাস্ত্র যা অধ্যয়ন করলে সামগ্রিকভাবে এর দলীল-প্রমাণ, তার অবস্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।[২]

علم الفقه ও اصُول الفقه এর আলোচ্য বিষয়

ইসলামী শরী'আতের মূল উৎসসমূহ থেকে সংগৃহীত দলীল-প্রমাণসমূহ এবং কিভাবে ঐ সকল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে আইন বিষয়ক

---

১. আবদুল ওহাব খাল্লাফ, ইলমু উছূলিল ফিক্‌হ, পঞ্চদশ সংস্করণ : ১৯৮৩, কায়রো, মিসর, পৃ. ১১

২. ফখরুদ্দীন আল-রাযী, আল-মাহসূলাফী ইলমি উছূলিল ফিক্‌হ, ১ম সংস্করণ ১৯৭৯, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিংবা দলীল-প্রমাণ বর্ণনায় পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও কিভাবে অগ্রাধিকার নির্বাচন করা হয়েছে এ সকল বিষয় আলোচনা ও অধ্যয়ন 'উছূলে ফিক্‌হের' বিষয়বস্তু।[৩]

আর علم الفقه এর বিষয়বস্তু হলো, ইসলামী শরী'আতের প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধান অনুযায়ী বান্দাহ ও তার জীবনের যাবতীয় কার্যাবলী। সুতরাং একজন "ফকীহ" মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক, এককথায় "আকাইদ, শিষ্টাচার, আখলাক, ইবাদাত এবং মু'আমালাত" সংক্রান্ত জীবনের সকল বিভাগের সকল কাজে শরী'আতের বিধি নিষেধ মেনে চলার বিষয়ে গবেষণা করেন। 'উছূলে ফিক্‌হের' গবেষণার বিষয় হলো, ইসলামী শরী'আতের হুকুম আহকামের যাবতীয় দলীল-প্রমাণ। সুতরাং 'উছূলে ফিক্‌হের' গবেষক গবেষণা করেন কিয়াস ও তার প্রমাণাদির উপর, কোনটা العام (আম) ও কোনটা الخاص (খাস), কোনটা الأمر (আমর) ও কোনটা النهي (নাহী) ইত্যাদি।[৪]

علم الفقه এর প্রয়োজনীয়তা

علم الفقه এর আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য ইসলাম যেহেতু একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও কল্যাণকর জীবন-ব্যবস্থা, সেহেতু কিয়ামাত পর্যন্ত সমসাময়িক যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে "ইজতিহাদের" মাধ্যমে ইসলামী শরী'আতের হুকুম আহকাম, আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ উদ্ভাবন, প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করা শর'ঈ প্রয়োজন। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে "ইজতিহাদ" করার যোগ্যতা দিয়েছেন তাঁদের কর্তব্য, ইসলামের উৎসসমূহ থেকে দলীল-প্রমাণ অনুসারে "ইজতিহাদ" করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হাসিল করা, علم الفقه ও তার ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এর মাধ্যমে পরিস্থিতির প্রয়োজন পূরণ করার জন্য প্রদত্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্য থেকে একটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে মানবতার জন্য প্রমাণিত কল্যাণধর্মী বিধান হিসেবে কার্যকর করা।

---

৩. অধ্যাপকবৃন্দ, শরী'আ ফ্যাকাল্টি, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, উছূলুল ফিক্‌হ-এর টিকাসমূহ, শিক্ষাবর্ষ ১৯৬৩, পৃ. ২২

৪. আবদুল ওহাব খাল্লাফ, ইলমু উছূলিল ফিকহ্‌, পঞ্চদশ সংস্করণ : ১৯৮৩, কায়রো, মিশর, পৃ. ১২-১৩

علم الفقه এর উৎস

মহান রাব্বুল আলামীন মানব জাতির জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে পেশ করে তাঁর বান্দাহদের সামনে প্রয়োজনীয় সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং বাস্তব উদাহরণসমূহ পেশ করেছেন, যাতে শরী'আতের উপকরণসমূহ পেতে কোন অসুবিধা না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে যে দু'টি উৎস থেকে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, আইনের সে দু'টি উৎস হচ্ছে : القرآن الكريم ও السنة النبوية।

পরবর্তী যুগে ইসলামী চিন্তাবিদ ও নির্ভরযোগ্য মনীষীগণ কর্তৃক 'ইল্‌মুল ফিক্‌হ' এর উৎস হিসেবে আরো দুটি বিষয়কে বিবেচনা করা হয়। তা হলো ঃ الاجماع ও القياس।

(১)القران الكريم ঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে যে সকল শব্দ বা বাণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নাযিল হয়েছিল, যা তিলাওয়াত করা ইবাদাত হিসেবে গণ্য, মানবজাতির কাছে যার সংক্ষিপ্ততম সূরার অনুরূপ সূরা রচনা করার জন্য চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়েছিল, যার প্রতিটি বর্ণ সন্দেহাতীত ও নির্ভুল ধারাবাহিকতার মাধ্যমে তাওয়াতুর সনদে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, যা আমাদের নিকট পবিত্র "মাছহাফ" হিসেবে বর্তমান আছে, যার শুরু হয়েছে সূরা আল 'ফাতিহা' দ্বারা ও শেষ হয়েছে সূরা আন্‌ 'নাস' দ্বারা তা-ই আলকুরআন।

(২) السنة النبوية ঃ পবিত্র আল-কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ (কুরআন ব্যতিরেকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন, করেছেন এবং সমর্থন করেছেন তার সবই সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) الاجماع ইজমা ঃ কোন সমস্যার সমাধান আল-কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে পাওয়া না গেলে তার সমাধানের জন্য সমসাময়িক যুগের প্রধান আলিম ও ইসলামী আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্মিলিতভাবে কুরআন-সুন্নাহর মৌলনীতির আলোকে কোন একটি একক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে ইজমা বলে।

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

"এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও।"[৫]

---

৫. সূরা আল-বাকারা : ১৪৩।

ইজমার বিষয়টি যে জানতে পেরেছে তার পক্ষে ইজমা হচ্ছে চূড়ান্ত ও অকাট্য 'নসের' মতো। এ ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করার কোন অবকাশ নেই। বরং কোন প্রকার বর্ণনা বা ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। তবে কোনো কোনো ফকীহর মতে, ইজমার প্রমাণ হওয়া দলীল বা সনদের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং উম্মাতের জন্য তার মর্যাদাপূর্ণ সত্তার এবং শরী'আতের আহ্‌কামের স্থায়িত্বের কারণেই তা প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত।[৬] এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী হলো ঃ لا تجتمع امتى على ضلالة (আমার উম্মাত কখনো গোমরাহীর উপর একমত হবে না)।[৭]

(৪) القياس কিয়াস ঃ অর্থ তুলনা করা বা তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করা। যদি কুরআন হাদীস ও ইজমাতে কোন সমস্যার সমাধান না পাওয়া যায় তবে কুরআন ও হাদীসের অনুরূপ কোন সমাধান থেকে তুলনা করে সমস্যার সমাধান করাকে "কিয়াস" বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন থেকেই কিয়াসের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হযরত আমরের কিয়াসের ঘটনা; তিনি সংগম জনিত নাপাকির দরুন পানি না পেয়ে গোসলের সাথে তায়াম্মুমকে (পবিত্রতা অর্জনের জন্য পাক মাটি বা ধুলির সাহায্যে মুখমণ্ডল ও দু'হাত মাছেহ করা) তুলনা করে তাঁর সারা শরীর ধুলি দ্বারা মুছে নিয়েছিলেন।[৮]

"ইজতিহাদ"

اجتهاد ঃ "ইজতিহাদ"। যে সকল নতুন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সরাসরি পাওয়া যায় না, তার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি অনুসরণ করে বের করে নেয়ার জন্য একনিষ্ঠ সাধনাকেই "ইজতিহাদ" বলা হয়। যারা "ইজতিহাদের" কাজ করেন তাঁদেরকে "মুজতাহিদ" বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনেই কোন কোন বিষয়ে তিনি নিজেই "ইজতিহাদ" করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর "ইজতিহাদ" কখনো আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা সমর্থিত হয়েছে আবার কখনো কখনো আল্লাহ আরও অধিক কল্যাণকর কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা রাসূল (সা) কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাকে রদ করেছেন। বস্তুত রাসূল (সা) কর্তৃক সম্পাদিত 'ইজতিহাদ' সাহাবীগণ এবং তৎপরবর্তী যুগের

---

৬. হাশীয়া আল-গুযীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮
৭. সুনানে ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী।
৮. সহীহ আল-বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাযাহ।

মুসলিমদের জন্য অনুসরণীয় উদাহরণ স্থাপন করেছে এবং ইজতিহাদের বৈধতা প্রদান করেছে। যাতে কোন বিষয়ে কুরআন এবং সুন্নাতে সুস্পষ্ট আইনগত সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে তাঁরা নিজেরাই ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। যেমন– হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামান প্রেরণ কালে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন ঃ "তোমার নিকট কোন বিষয়ে যদি ফায়সালা চাওয়া হয় তখন তুমি কি করবে? মু'আয (রা) বললেন, "আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করবো," রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি সে বিষয়ে আল্লাহর কিতাবে কোন সমাধান না পাও? মু'আয বললেন, "তখন আমি রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ অনুসারে ফায়সালা করবো।" রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তুমি সুন্নাহতেও তা না পাও তাহলে কি করবে? মু'আয বললেন, "তখন আমি 'ইজতিহাদের' মাধ্যমে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।" রাসূল (সা) হযরত মু'আযের বুকে চাপড় দিয়ে বললেন, "আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মনঃপূত।"[৯]

হযরত মু'আয (রা) কর্তৃক 'ইজতিহাদ' এবং তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে হযরত উমার (রা) কর্তৃক হযরত আবু মুসাকে বিচারক নিয়োগ করে প্রদত্ত উপদেশাবলী থেকে এ বিষয়ের ধারণাটি আরও বিস্তৃত হয়েছে। যেমন ঃ "তুমি আল কুরআনের নির্দেশের ভিত্তিতে অথবা সুন্নাহর কোন প্রতিষ্ঠিত আমলের উপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করবে।" অতঃপর তিনি আরও বলেছিলেন, "তোমার নিকট আনীত বিষয়গুলোর কোনটি সম্পর্কে তুমি যদি নিশ্চিত হও যে, আল-কুরআন বা সুন্নাহর কোন নির্দেশ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তাহলে তোমার কাজ হবে আল-কুরআন বা সুন্নাহর হুকুমের তুলনা করে "কিয়াস" বা সাদৃশ্য অনুসন্ধান করা। এ কাজ সত্য ও ন্যায়ের নিকটবর্তী এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম হবে এ আশা করা যায়।"[১০]

ইমাম শাফেঈর (র) মতে এক অর্থে ইজতিহাদ হলো "অভিমত", অপর অর্থে

---

৯. ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী, আল ইজতিহাদ ওয়াত-তাকলীদ (কায়রো, দারুল আনসার) পৃ. ২৩-২৪, আবু দাউদ, কিতাবুল কাদা, বাব নং-১১, ইজতিহাদ বির রায় ফিল-কাদা।

১০. ইবনু কায়্যিম, ইলমুল মুয়াক্কিঈন, পৃ. ৫৪

ইজতিহাদ হলো "কিয়াস"। তিনি মনে করেন, এ দু'টো হলো একই বিষয়ের দু'টি নাম।[১১]

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে ইজতিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন, যেমন নিম্নোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, "যখন বিচারক ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তখন সে দু'টি পুরস্কার পায়, তার সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয় তবে সে অন্ততঃ একটি পুরস্কার পায়।"[১২]

شروط الاجتهاد ইজতিহাদের শর্তাবলী

মানব জাতির সামগ্রিক জীবনে সমসাময়িক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনের নির্দেশের ভিত্তিতে অথবা সুন্নাতুর রাসূল (সা)-এর কোন প্রতিষ্ঠিত আমলের উপর ভিত্তি করে কোন রায় পাওয়া না গেলে, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশের তুলনা বা قياس অনুসন্ধান করা হলো মুজতাহিদের কাজ।

ইজতিহাদ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য ইজতিহাদকারীকে যে সকল শর্তাবলী পূরণ করতে হয় তা নিম্নরূপ ঃ[১৩]

এক. ماهر باللغة العربية মুজতাহিদকে অবশ্যই আরবী ভাষায় দক্ষ ও পারদর্শী হতে হবে, আরবী ইবারতের ও শব্দাবলীর ব্যবহার কোন্ পারিপার্শ্বিকতায় কোন্ অর্থে নেয়া হয় তা জানতে হবে। আরবী ভাষার বাকরীতি ও তার মাধ্যমে প্রণীত বিষয় ও জ্ঞানের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে। আরবী ভাষার সাহিত্যসমূহ, অলঙ্কার শাস্ত্র, গদ্য ও পদ্যের ভাণ্ডার সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকবেন। একজন আরবীভাষী যেভাবে তা বুঝেন সেভাবে মুজতাহিদেরও আরবী ভাষা বুঝার শক্তি থাকতে হবে যাতে তিনি আরবী ইবারতের অর্থ ও উদ্দেশ্য, বিশেষ অর্থ বুঝতে পারেন ও তার ভিত্তিতে সঠিক মতামত পেশ করতে পারেন।[১৪]

দুই. ماهر فى علوم القران মুজতাহিদকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনের জ্ঞানে

---

১১. ইমাম শাফে'ঈ, আর রিসালাহ, কায়রো, পৃ. ৪৭৬

১২. হাদীস, সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল কাদা।

১৩. আবদুল ওহাব খাল্লাফ, ইলমু উছুলিল ফিকহ্, পঞ্চদশ সংস্করণ : ১৯৮৩, কায়রো, মিসর, পৃ. ২১৮-২১৯।

১৪. কাশফুল আসরার-৪/১৬

পারদর্শী হতে হবে, তিনি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শরী'আতের হুকুমসমূহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন। যেসকল আয়াতে উক্ত হুকুমসমূহ এসেছে তা থেকে উক্ত আহকাম উদ্ভাবন করার পদ্ধতিসমূহ তাঁকে জানতে হবে, আয়াতসমূহ নাযিলের প্রেক্ষাপট ও কারণসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে, এ সম্পর্কিত তাফসীর ও তাবীল আলোচনার উপর তার সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে, আহকামের আয়াত সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ হবেন।[১৫]

তিন. ماهر فى علوم السنة মুজতাহিদকে অবশ্যই সুন্নাতুর রাসূল (সা) সম্পর্কিত "ইলমে" পারদর্শী হতে হবে। ইসলামী শরী'আতের হুকুম আহকাম যে সকল হাদীস থেকে চয়ন করা হয়েছে তা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, হাদীস শাস্ত্রের বর্ণনা পরম্পরার স্তরসমূহ সহ সহীহ ও য'ঈফ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বর্ণনাকারীদের স্তরসমূহ সহ হাদীসের মুতাওয়াতির, মাশহূর, সহীহ, হাসান ও য'ঈফ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে আহকাম উদ্ভাবনের পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে দক্ষতা থাকতে হবে এবং আহকাম সংক্রান্ত হাদীসসমূহের উপর পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।[১৬]

চার. أن يعرف وجوه القياس মুজতাহিদকে "কিয়াস" বা (কুরআন ও সুন্নাহর আহকামসমূহের) তুলনা বা সাদৃশ্যের বিভাগসমূহের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে, যেই উদ্দেশ্যে শরী'আতের হুকুমসমূহ প্রবর্তন করা হয়েছে তা জানতে হবে, এ জন্যে শরী'আত প্রণেতার পদ্ধতিসমূহ অবগত হতে হবে, সমসাময়িক মানব সমাজের অবস্থাসমূহ তাঁর নখদর্পণে থাকবে, তাদের সত্যিকার কল্যাণের জন্যে যেসকল বিষয়ের উপর সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি নেই তার স্থলে "কিয়াস" করে হুকুম বের করার পদ্ধতি জানা থাকতে হবে।[১৭]

পাঁচ. أن يعرف اجتهاد الصحابة والتابعين মুজতাহিদকে অবশ্যই ছাহাবী এবং তাবে'ঈগণের ইজতিহাদ সম্পর্কে বিশেষ করে তাঁরা যে সকল নীতিমালার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন, সেগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হতে হবে। বিশেষ করে খুলাফা-ই রাশিদীনের সময় সাহাবা-ই কিরামের ইজতিহাদ, ইজমা ও তার পটভূমি সম্পর্কিত ইতিহাস সম্পর্কেও তাকে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী হতে হবে।[১৮]

---

১৫. আল-ইহ্‌কাম-৩/৩৫

১৬. ফাতহুল গাফফার-৩/৩৫

১৭. আল-মুসতাস্‌ফা-৩/৩৫৫

১৮. প্রাগুক্ত-৩/৩৫১

ছয়. أن يكون عالما بأصول الفقه মুজতাহিদকে উছূলে ফিকহের উপর গভীর জ্ঞানী হতে হবে। উছূলে ফিকহের ব্যাপক নিয়মাবলী, সাধারণ দলীলসমূহ ও উক্ত দলীলসমূহ দ্বারা উপকৃত হওয়ার পদ্ধতিসমূহ এবং এর থেকে উপকৃত লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। তাকে জানতে হবে :

اَلنَّاسِخُ (যে দলীল দ্বারা অন্য বিষয়কে রহিত করা হয়েছে)। اَلْمَنْسُوْخُ (যাকে রহিত করা হয়েছে), اَلْعَامُّ (সাধারণ ও ব্যাপক অর্থ), اَلْخَاصُّ (বিশেষ ও সংক্ষিপ্ত অর্থ), اَلْمُطْلَقُ (বাধাহীন সাধারণ অর্থ), اَلْمُقَيَّدُ (সীমাবদ্ধ ও শর্তযুক্ত অর্থ), اَلْمُجْمَلُ (সার-সংক্ষেপ), اَلْمُبَيِّنُ (বিস্তারিত স্পষ্ট অর্থ), اَلإِسْتِحْسَانُ (উত্তম বিবেচনায় অনুমোদন), اَلْعُرْفُ (প্রচলিত রীতি), اَلْمَفْهُوْمُ الْمُخَالَفَةُ (বিপরীত অর্থ), ইত্যাদি সম্পর্কিত নিয়মাবলী।[১৯]

সাত. أن يكون عالما بمقاصد الشريعة তাকে ইসলামী আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে। এর অন্তর্নিহিত প্রভাব ও লক্ষ্যসমূহ জানার সাথে সাধারণ মানুষের কল্যাণ কিসে এবং তাদের প্রচলিত রীতিসমূহের কল্যাণকর বিষয় কী কী তাও তাকে রপ্ত করতে হবে।[২০]

আট. أن يكون صاحب العدالة তাকে হতে হবে উত্তম মেজাযের আল্লাহভীরু, যিনি কখনও ইচ্ছাকৃত কবীরা গুনাহ করেননি ও ছগীরা গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকেননি এবং ভদ্রতা ও শিষ্টাচারী চরিত্রের বিপরীত কোন কাজে জড়িয়ে পড়েননি।[২১]

নয়. أن يكون عالما من احكام بما أجمع عليه الامة তিনি যে সকল বিধান সম্পর্কে اجماع হয়েছে তার সার্বিক বিষয়ে অবগত হবেন, যাতে করে উম্মাত কর্তৃক ঐকমত্য পোষণকারী বিষয়ের পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ না নেন।[২২]

দশ. أن يطلع على مسالك العلماء فى الفروع الفقهية তিনি ইসলামী মনীষীদের দ্বারা কৃত বিধিবিধানের খুঁটিনাটি মাসআলাসমূহ প্রণয়ন করার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবেন ও তার বিস্তারিত দলীলসমূহ দ্বারা উপকৃত হওয়ার পদ্ধতির ব্যাপারে অবগত থাকবেন।[২৩]

---

১৯. প্রাগুক্ত-২/৩৫০

২০. আল-মুসতাসফা-২/৩৫৩

২১. আল-মুদখাল ইলা মাযহাব ইমাম আহমাদ, পৃ. ১৮৩

২২. শরহুল কাওকাবুল মুনীর, পৃ. ৩৯৫

২৩. আল-মাদখা' লিল ফিকহিল ইসলামী লিল উস্তাজ ইসুই আহমাদ ইসুয়ী, পৃ. ২৪৫

مقاصد الشريعة ইসলামী শরী'আর উদ্দেশ্যসমূহ

মহান রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত শরী'আতে প্রতিটি বিধানেরই রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য। শরী'আর এসকল মাকাছিদ বা উদ্দেশ্যকে তিনটি প্রকরণে ভাগ করা হয়েছে, যার প্রত্যেকটির রয়েছে আলাদা আলাদা প্রকারভেদ ঃ[২৪]

প্রথম প্রকরণ ঃ মৌলিকত্বের দিক থেকে মাকাছিদ আশ্ শরী'আহ দু'প্রকার ঃ المقاصد الاصلية। মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী ও المقاصد الفرعية। গৌণ ও আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্যাবলী।

(১) المقاصد الأصلية **মৌলিক মাকাছিদ** দ্বারা শরী'আর প্রাথমিক উদ্দেশ্যাবলী বুঝানো হয়েছে, যেমন ঃ ছালাত আদায়ের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁকে সর্বদা স্মরণে রাখা, তাঁর নাফরমানীমূলক যাবতীয় কাজ ও অন্যায় অশ্লীলতা থেকে নিজকে মুক্ত রাখা।

(২) المقاصد الفرعية। **গৌণ ও আনুষঙ্গিক মাকাছিদ** দ্বারা পরবর্তী উদ্দেশ্যাবলী বুঝানো হয়েছে, যেমন ঃ ছালাত আদায়ের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করা, ওযুর মাধ্যমে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

দ্বিতীয় প্রকরণ ঃ ব্যাপকতার দিক থেকে "মাকাছিদ আশ-শরী'আহ" তিন প্রকার ঃ

(১) المقاصد العامة **ব্যাপক মাকাছিদ** ঃ ইসলামী শরী'আতে মানব জীবনের সকল বিভাগ ও সকল ক্ষেত্রে যেসকল কল্যাণকর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোই ব্যাপক মাকাছিদ, যেমন ঃ

(ক) المصالح العامة। **সবার জন্য কল্যাণ সাধন** আর সবার জন্যই অকল্যাণকর বিষয় প্রতিহত করণ।

(খ) اختيار الايسر। **সকল কাজেই সহজ পদ্ধতি অবলম্বন** ও কঠোরতার বিলোপ সাধন।

(২) المقاصد الخاصة। **নির্দিষ্ট মাকাছিদ** ঃ শরী'আর নির্দিষ্ট অধ্যায় ও বিষয় ভিত্তিক যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে তা হলো খাস মাকাছিদ, যেমন ঃ ছালাত, ছাওম, হাজ্জ, যাকাত ও জিহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য আল্লাহর আনুগত্য করা ইত্যাদি।

(৩) المقاصد المعلقة। **সংশ্লিষ্ট গৌণ উদ্দেশ্য** ঃ যা শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট

---

২৪. মাকাছিদুশ শরী'আহ আল-ইসলামীয়াহ, ড. মুহাম্মদ সাদ আল-ইয়ুবী, পৃ. ১৭৯

মাসয়ালার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমন ঃ ওযুর সময় নাকে পানি দেয়ার উদ্দেশ্য, ছালাতে রুকু আদায়ের উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রকরণ ঃ المصالح العامة এর ভিত্তিতে মানবতার জন্য যে সাধারণ কল্যাণ সাধন করার উদ্দেশ্যে শরী'আর হুকুম আহকাম প্রণীত হয়েছে সেদিক থেকে মাকাছিদে শরী'আহ তিন প্রকার :

(১) الضروريات (২) الحاجيات (৩) التحسينيات।

১. الضروريات অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী

এ হলো দীন ও দুনিয়ার সে সকল জরুরী বিষয়সমূহ, যার অভাবে দুনিয়ার কল্যাণের সঠিক গতিধারা ব্যাহত হয় বরং এ ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিপর্যয়, সীমাহীন ক্ষতি ও প্রাণ হারানোর ঘটনা, আর আখিরাতে নাজাত ও নিয়ামত লাভ হয় সুদূর পরাহত এবং সুস্পষ্ট ক্ষতিতে নিমজ্জিত হওয়া হয় অবধারিত।"[২৫]

অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ পাঁচটি

حفظ النفس ، حفظ الدين ، حفظ العرض ، حفظ العقل وحفظ المال.

(ক) حفظ النفس (জীবনের হিফাযাত) : মানব জীবনের হিফাযাতের জন্য ইসলাম খুব বেশি গুরুত্বারোপ করেছে, জীবনের সুরক্ষার জন্য এবং জীবনকে সকল ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য ইসলামে প্রণীত হয়েছে বহু হুকুম-আহকাম যেমন ঃ

* মানুষের জীবনের উপর অবৈধভাবে হামলা করা হারাম,
* মানুষ হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী সকল উপায়-উপকরণ নিষিদ্ধ,
* কিছাছ (হত্যার বদলে হত্যা) নির্ধারণ,
* হত্যাকারীর বিরুদ্ধে শাস্তি কার্যকর করার জন্য তার অপরাধ সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করা, যাতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।
* আক্রান্ত হওয়ার কারণে জীবনের যেসকল ক্ষতি হয়ে থাকে তার ক্ষতি পূরণ দিতে আক্রমণকারীকে বাধ্য করা,
* কিছাছের শাস্তি প্রয়োজনে ক্ষমা করার বিধান রাখা,
* জীবন রক্ষার জন্য জরুরী অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণের অনুমতি প্রদান করা।

---

২৫. ইমাম শাতিবী, আল-মুয়াফাকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮

আল্লাহর নির্দেশ হলো ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ.

'কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না।"[২৬]

(খ) حفظ الدين (দীনের হিফাযাত) ঃ দীন বলতে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট থেকে অবতীর্ণ দীন-ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর বাণী হলো ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।"[২৭]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْأٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসন্ধান করে, আল্লাহ কখনোই তার নিকট থেকে তা কবুল করবেন না, সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২৮]

দীন হিফাযাতের উপায় ও পন্থা

মহান আল্লাহ নিজেই এ দীনকে হিফাযাতের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন (اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ) "নিশ্চয় আমি এ বিধান নাযিল করেছি এবং আমিই তার হিফাযাতকারী।"[২৯] দীনকে হিফাযাতের জন্য আল্লাহ যে সকল পন্থা ও উপায় অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে :

* **(الاعمال بمطابقة الدين) দীনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা :** দীন হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয়। প্রত্যেক মুসলিমের উপরই দীনের সুরক্ষার জন্য সে অনুযায়ী আমল করা জরুরী। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর ছালাত, ছাওম, হাজ্জ, যাকাত ও জিহাদসহ আরো অনেক আমল ফরয করেছেন। দীন অনুযায়ী আমল করার একটা সর্বনিম্ন সীমা রয়েছে যা অতিক্রম

---

২৬. সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৩
২৭. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯
২৮. সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫
২৯. সূরা আলে হিজর ঃ ৯

করার অনুমতি কাউকে দেয়া হয়নি; তা হচ্ছে ফরয ওয়াজিব মেনে চলা এবং কবীরা গুনাহসমূহ পরিত্যাগ করা।

*** (الحكم بمطابقة الدين) দীনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনের যাবতীয় বিভাগ পরিচালনা করা :** মহান আল্লাহর ঘোষণা :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম ফায়সালা করেনা তারা কাফির।"[৩০]

*** (الدعوة الى دين الله تعالى) আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করা :**

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَـأْمُرُوْنَ بِـالْمَعْرُوْفِ وَيَنْـهَوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক অবশ্যই থাকবে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম।"[৩১]

*** (الجهاد في سبيل الله) আল্লাহর পথে জিহাদ করা :** জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ হলো দীনকে হিফাযাত করার অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল কর্মকাণ্ডই জিহাদ। ইসলামকে আল্লাহর যমীনে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ও রাখার জন্য ইসলামী জামা'আতের ইমাম অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের নেতৃত্বে যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তাও জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ। আল্লাহ বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَـهُمْ بِـاَنَّ لَـهُمُ الْجَنَّـةَ يُقَـاتِلُوْنَ فِـىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, বিনিময়ে তাদের জন্য আছে জান্নাত, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়।"[৩২]

---

৩০. সূরা আল মাইদাহ্ ঃ ৪৪
৩১. সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪
৩২. সূরা আত্ তাওবা ঃ ১১১

(গ) حفظ العرض (মান-মর্যাদা তথা বংশধারার হিফাযাত) ঃ

* এজন্য ইসলাম মানুষকে বংশবৃদ্ধির বৈধ পন্থা হিসেবে বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

* জন্মদানে সক্ষম নারীকে বিয়ে করার প্রতি উৎসাহিত করেছে।

* এ ব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত করার জন্য ইসলাম যেনাকার পুরুষ ও নারী ও যেনার অপবাদকারীর কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করেছে।

(ঘ) حفظ العقل ('আকল বা বিবেকের হিফাযাত) : ইসলামে দু'ভাবে 'আকলকে হিফাযাতের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ঃ

এক. (الأدوات الخارجية) 'আকল নষ্টকারী বাহ্যিক উপকরণসমূহ থেকে হিফাযাত করা।

যেমন ঃ মদ, ড্রাগ, হিরোইন ও নেশা হয় এমন অন্যান্য মাদক দ্রব্য। আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তা তোমরা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৩৩]

দুই. (الأدوات الداخلية) 'আকল নষ্টকারী আভ্যন্তরীণ উপকরণসমূহ থেকে হিফাযাত করা। যেমন : বাতিল ধর্ম-মতবাদ, কুফরী ও শিরকী সমাজ, মানব-রচিত বিধানে পরিচালিত রাজনীতি-অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভ্রান্ত ধারণাসমূহ যা আকলকে বিভ্রান্ত করে, তা থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তার নিন্দা করে বলেন :

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلاً.

"তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারা তো পশুর মতই বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট।"[৩৪]

---

৩৩. সূরা আল-মাইদাহ্ ঃ ৯০
৩৪. সূরা আল-ফুরকান ঃ ৪৪

(ঙ) حفظ المال (সম্পদের হিফাযাত) ঃ ইসলাম মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য সার্বিক ব্যবস্থার বিধান দিয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ হলো :

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ .

"তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকেও।"[৩৫]

এ জন্য ইসলামে নিম্নোক্ত উপায় ও পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে :

* হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা,
* অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করাকে হারাম ঘোষণা করা,
* সম্পদ বিনষ্ট বা অপচয় করাকে হারাম করা,
* চুরি ডাকাতির শাস্তির ব্যবস্থা করা,
* ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ক্ষতিপূরণ করা,
* ঋণ প্রদানের সময় সাক্ষী রাখা ইত্যাদি।

২. الحاجيات মানব জীবনের প্রয়োজনসমূহ

মানব জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য তার প্রয়োজন অনেক কিছু। এগুলো হলো আল-হাজিয়্যাত। ইমাম শাতিবী (র)-এর সংজ্ঞায় বলেন : আল-হাজিয়্যাত হলো সেই সকল বিষয়, মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের জন্য এবং কঠোরতা, সমস্যা ও অসুবিধা দূরীভূত করার জন্য যা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলোর প্রতি যদি বিশেষ নজর দেয়া না হয় তাহলে সাধারণভাবে বান্দার উপর সমস্যা ও অসুবিধা আরোপিত হয়, তবে তা জনকল্যাণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিপর্যয় সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না।[৩৫-ক]

আল-হাজিয়্যাত এর হিফাযতের জন্য ইসলামী শরী'আহ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করেছে :

(ক) ইবাদাতের ক্ষেত্রে উদ্ভূত অসুবিধাসমূহ দূরীভূত করা হয়েছে, যা সচরাচর মানুষের পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর। আল্লাহ বলেন,

---

৩৫. সূরা আল-আনফাল ঃ ৬০
৩৫-ক. আল-মুয়াফিকাত ঃ ২/১১

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।[৩৬]

مَايُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ.

"আল্লাহ তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করতে চান না... ।"[৩৬-ক]

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইবাদাতে রুখসাতের (সুবিধাজনক পন্থা) ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তির জন্য রমযানে ছাওম ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে। এছাড়াও মুসাফির ব্যক্তির জন্য সফরে কসর ছালাত আদায়ের বিধান রাখা হয়েছে। পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা হলে তায়াম্মুমের বিধান রাখা হয়েছে। শরী'আয় এ রকম আরো অনেক রুখসাত রয়েছে।

(খ) মানুষ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হিসাবে নানা প্রকার অসংখ্য পবিত্র বস্তুর আহার ও ব্যবহার তাদের জন্য বৈধ করে দেয়া হয়েছে।

(গ) মু'আমালাতের ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারাহ, বাই সালাম, মুদারাবা প্রভৃতি ব্যবসায়ী পদ্ধতি জায়েয করা হয়েছে।

৩. التحسينيات জীবন যাপনে শোভাবর্ধনকারী বিষয়সমূহ

এ পর্যায়ে ইমাম শাতিবী (র) বলেন, যা উত্তম বলে বিবেচিত তা গ্রহণ করা এবং সুস্থ সবল বিবেক যাকে ঘৃণা করে এমন সব নিকৃষ্ট জিনিস পরিহার করাকে التحسينيات বলা হয়।[৩৭]

যেমন :

(ক) রুচিকর সুন্দর খাবার ও পোশাক গ্রহণ করা। (খ) শরীর ও পোশাক থেকে মলিনতা দূর করা। (গ) ফরয ও ওয়াজিব আদায়ের পর সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজ সাধ্যমত করা। (ঘ) ভদ্রতা ও শিষ্টাচার অবলম্বন করা। (ঙ) আখলাক ও চরিত্রের ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছার চেষ্টা করা।

---

৩৬. সূরা আলা-হাজ্জ ঃ ৭৮

৩৬-ক. সূরা আল-মাইদাহ ঃ ৬

৩৭. আশা-শাতিবী, আল-মুয়াফিকাত ২/১১

الأحكام الشرعية। শরী'আতের হুকুমসমূহ

ইসলামী শরী'আতের হুকুমসমূহকে প্রথমত পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন : الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة। ইসলামী শরী'আতের ফকীহগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করে আরও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আল্লাহর আনুগত্যকে আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

(১) الأحكام الفريضية। **ফরয হুকুমসমূহ** : যেমন ছালাত, ছাওম, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে অতি জরুরী হিসেবে আদায় করার জন্য হুকুম করা হয়েছে। এগুলো দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

• الفريضة العينية। **ফরযে আইন** ঃ যে কাজগুলো সকল মুসলিমের জন্য পালন করা জরুরী। যেমন : ছালাত আদায় করা, الحجاب। ব্যবস্থা মেনে চলা ইত্যাদি।

• الفريضة الكفائية। **ফরযে কিফায়া** ঃ যে কাজগুলো কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলেই সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। যেমন ঃ জানাযার ছালাত, হাসপাতাল তৈরি করা, ডুবন্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করা, অগ্নি নির্বাপন করা, চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, ইত্যাদি।

(২) الواجب। **ওয়াজিব** ঃ যে কাজ করা জরুরী তবে ফরযের মত নয়, যেমন বিতর ও দু'ঈদের ছালাত, ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ইত্যাদি।

(৩) السنة। **সুন্নাহ** ঃ যে সকল কাজ রাসূল (সা) অধিকাংশ সময় নিজে করেছেন, তবে মাঝে মাঝে পরিত্যাগও করেছেন যেমন ছালাতুল যুহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত ও উমরা আদায় করা ইত্যাদি।

* সুন্নাত দু'প্রকার ঃ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও সুন্নাতে যায়িদাহ,

(ক) السنة المؤكدة। **সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ** ঃ ঐ সকল কাজকে বলা হয় যা রাসূল (সা) নিজে করতেন ও অন্যকে তা করার জন্য বলতেন, যেমন ছালাতুল ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত, যুহরের পরে দু'রাক'আত ও মাগরিবের এবং ইশার পরে দু'রাক'আত করে ছালাত আদায় করা।

(খ) السنة الزائدة। **সুন্নাতে যায়িদাহ** ঃ ঐ সকল কাজকে বলা হয় যা রাসূল (সা) মাঝে মাঝে করতেন, যেমন আসর ও ইশা ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত আদায় করা।

(৪) الاستحباب **মুস্তাহাব** ঃ ঐ সকল কাজ যা আদায় করাকে পছন্দ করা হয়েছে না করলে কোন অপরাধ ধরা হয়নি, যেমন– যুহর, মাগরিব ও ইশার ছালাতের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা ইত্যাদি।

(৫) الحلال **হালাল** হলো বৈধ কাজ, যেমন, উট, দুম্বা গরু ও ছাগলের গোশত খাওয়া এবং এগুলোর দুধ পান করা ইত্যাদি।

(৬) الحرام **হারাম** হলো অবৈধ বা নিষিদ্ধ কাজ। যেমন, যিনা করা, চুরি করা, সুদ গ্রহণ করা, শুকরের গোশত খাওয়া ইত্যাদি।

(৭) المكروه **মাকরূহ** হলো ঐ সকল কাজ যা অপছন্দনীয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যেমন– ফাসিক ও বিদ'আতী লোকের ইমামাত করা, খালি গায়ে ছালাত আদায় করা,

মাকরূহ কে দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে ঃ যেমন–

(ক) المكروه التحريمى **মাকরূহ তাহরিমী** ঃ যে কাজগুলো অধিক অপছন্দনীয় কিন্তু হারাম নয়। যেমন– ঈদগাহ্ ও লোক চলার পথে ঘাটে মল মূত্র ত্যাগ করা, কবরস্থান-কে অপবিত্র করা ইত্যাদি।

(খ) المكروه التنزيهى **মাকরূহ তানযিহি** ঃ যে কাজগুলো হালালের নিকটবর্তী তবে হালাল নয়। যথা ঃ পশুর গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেয়া, দাঁড়িয়ে পানি পান করা, ইত্যাদি।

(৮) المباح **মুবাহ** ঐ সকল কাজ যা বৈধ। যেমন, কৃষি কাজ, ব্যবসা বাণিজ্য করা, সামর্থ্যবানের জন্য একাধিক বিয়ে করা ইত্যাদি।

اصطلاحات الاحكام الشرعية ইসলামী আইনের বিষয়সমূহ

"ইসলাম হলো মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ শান্তিময় জীবন ব্যবস্থা" তাই তার আইন কানুন মানব জীবনের সকল বিভাগে পরিব্যাপ্ত। নিম্নে তার বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হলো ঃ[৩৮]

(১) فى العقائد আল-'আকাইদ :

আল্লাহর প্রতি ঈমান, রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত, আসমাউচ্ছিফাত ও ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান,

---

৩৮. আবু বকর, জাবের আল-জাযায়েরী, মানহাজুল মুসলিম, দারুস সরুক, জেদ্দাহ, ১৯৮৫, পৃ. ৭০৭-৭২৪

রাসূলদের প্রতি ঈমান, হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ঈমান, কবরের শাস্তি ও শান্তির প্রতি ঈমান, তাকদীরের প্রতি ঈমান ইত্যাদি।

(২) في الاداب শিষ্টাচার :

নিয়াত, আল্লাহর হক, পবিত্র কুরআনের হক, রাসূল (সা) এর হক, নাফসের হক, তাওবা, আল্লাহকে হাজির নাজির জানা, আত্মসমালোচনা, দীনের পথে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা, বান্দাহর হক– পিতা-মাতার প্রতি, সন্তানদের প্রতি, ভাইদের প্রতি, স্বামী-স্ত্রীর প্রতি, প্রতিবেশির প্রতি, নিকটাত্মীয়দের প্রতি, মুসলিমের প্রতি, কাফিরের প্রতি, অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি, আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও শত্রুতা করা, আল্লাহর পথে দীনী ভাইয়ের হক আদায়, মজলিসের আদব, খাওয়ার আদব, আত্মীয় ও মেহমানের প্রতি দায়িত্ব, সফরের আদব, পোশাক, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী, ঘুমের আদব এবং বড়কে সম্মান ও ছোটকে স্নেহ করা ইত্যাদি।

(৩) في الأخلاق আখলাক ও চারিত্রিক বিষয়

উত্তম চরিত্রের উপকরণসমূহ যেমন : ধৈর্য ধারণ, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা, অপরের হককে অগ্রাধিকার দেয়া ও কল্যাণের কাজকে পছন্দ করা, ন্যায় ও ইনসাফ করা, করুণা ও দয়া, লজ্জাবোধ করা, উত্তম কাজের প্রতি উৎসাহ, সততা, দান ও সহযোগিতা করা, বিনয়ী হওয়া ও গর্ব অহংকার পরিত্যাগ করা, খারাপ চরিত্রের উপকরণসমূহ যেমন : যুল্‌ম-অত্যাচার, হিংসা, লোক দেখানো কাজ, অহমিকা, প্রতারণা, অলসতা ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করা ইত্যাদি।

(৪) العبادات الشخصية ব্যক্তিগত ইবাদাতসমূহ

পবিত্রতা ও তার মর্যাদা, আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, অপবিত্রতার বর্ণনা, পায়খানা পেশাবের আদব, ওযুর নিয়ম, ফজিলত, ফরযসমূহ, সুন্নাতসমূহ, মাকরূহ ও বাস্তব ওযুর পদ্ধতি, ওযু ভঙ্গের কারণ, ওযুর মুস্তাহাবসমূহ ইত্যাদি।

* গোছলের গুরুত্ব, তার মর্যাদা, মুস্তাহাবসমূহ, ফরয গোসল, গোসলের ফরযসমূহ, সুন্নাতসমূহ ও গোছলের বাস্তব পদ্ধতি, ওযু ভঙ্গের কারণ, ওযুর মুস্তাহাবসমূহ ইত্যাদি।
* তায়াম্মুমের গুরুত্ব, মর্যাদা, ফরযসমূহ, সুন্নাতসমূহ, তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ, তায়াম্মুম করার বাস্তব পদ্ধতি ইত্যাদি।

* মোজার উপর মাছেহ করা, শরীর আহত হলে তার ব্যাণ্ডেজ এর উপর মাছেহ করা, মাছেহ এর শর্তাবলী, মাছেহ করার বাস্তব পদ্ধতি ইত্যাদি।
* স্ত্রীলোকদের মাসিক হায়েজ ও নিফাসের বিধান, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, নিফাসের হুকুম, হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় ইবাদাতের পদ্ধতি ইত্যাদি।
* ছালাত এর হুকুমসমূহ, প্রয়োজনীয়তা, ফযিলত, ফরয. ওয়াজিব ও সুন্নাত এবং মাকরূহসমূহ, ছালাত ভঙ্গের কারণসমূহ, ছালাত অবস্থায় মুছল্লির কোন কাজ বৈধ, সাহু-সিজদা, ছালাত আদায়ের বাস্তব পদ্ধতি, জামা'আতে ছালাত আদায়, ইমাম হওয়ার শর্তাবলী, স্ত্রীলোকের ইমাম হওয়া, তায়াম্মুমকারীর ইমামত, ইমামের সুতরা, ইমামের অনুসরণ, অপছন্দনীয় লোকদের ইমামতি করা অবৈধ, ছালাতে কাতারবন্দী হওয়া, ইমামের ছালাত শুরুর পর নফল ছালাত অবৈধ ইত্যাদি।
* আযান এর গুরুত্ব, হুকুম, কারণ, ফজিলত, জুমু'আর দিনের ফজিলত, জুমু'আর আদাব, জুমু'আর বৈধতার শর্তাবলী, জুমু'আর রাক'আত সংখ্যা, জুমু'আর মাত্র এক রাক'আত পেলে, জুমু'আর ছালাত আদায়ের পদ্ধতি ইত্যাদি।
* ছালাতুল বিতর, হুকুমসমূহ, সুন্নাত পদ্ধতি ও বিতর ছালাতের পূর্বে করণীয় ইত্যাদি।
* ছালাতুন্নাফেলা, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, ছালাতুদ্দোহা, তারাবিহ, ওযুর পর দু'রাক'আত, সফর থেকে ফিরে দু'রাকআত, তাওবার দু'রাক'আত, মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত, ইস্তিখারার ছালাত, ছালাতুল হাজাহ, তাসবীহ এর ছালাত, শুকুরের ছালাত, ইসতিসকার ছালাত, জানাযার ছালাত, রোগীর জন্য ঔষধ ব্যবহারের হুকুম, রোগীকে দেখতে যাওয়া, লাশ পশ্চিমমুখী করা, মৃত স্বামী স্ত্রীর জন্য তিনদিন শোক পালন করা, লাশ গোসল করানো, জানাযার ব্যবস্থা করা, যিয়ারত করা ইত্যাদি।
* যাকাত দানের গুরুত্ব, হুকুম, ফজিলত, যাকাতের মালসমূহ, যাকাতের নিছাব, যাকাত বের করার নিয়মাবলী, যাকাত কাকে দিতে হবে, পদ্ধতি, ফিতরার গুরুত্ব, হুকুমসমূহ, পরিমাণ, সময় ও পদ্ধতিসমূহ ইত্যাদি।
* ছিয়াম এর সংজ্ঞা, ফরযিয়াত, ফজিলত, উপকারিতা, ফরয ছিয়াম, নফল ছিয়াম, ই'তিকাফ, ছিয়ামের মাকরূহাত ও ছাওম ভঙ্গের কারণসমূহ, কাফফারার পদ্ধতি ইত্যাদি।

* হাজ্জ ও উমরা পালন এর হুকুম, শর্তাবলী, রুকনসমূহ, ইহরাম, ইহরাম ভঙ্গের কারণসমূহ, কা'বাঘর তাওয়াফ, আরাফাতে অবস্থান, মদীনার মসজিদ যিয়ারত করা, হজ্জ ও উমরার পদ্ধতি ইত্যাদি।
* কুরবানী ও আকীকা, ফজিলত, হুকুমসমূহ ও শর্তাবলী ইত্যাদি।

(৫) أحكام المعاملات পারস্পরিক আচরণের হুকুমসমূহ

* জিহাদ ও তার হুকুম, প্রকারভেদ, ফজিলত, রুকনসমূহ, জিহাদের আদাব, জিহাদের নিয়মাবলী, যুদ্ধবন্দীদের সাথে করণীয়, আশ্রিতদের সাথে চুক্তি ও তার হুকুমসমূহ, গনীমাহ, ফাই, খারাজ, জিযিয়া, যুদ্ধবন্দী ও তার হুকুম, শারীরিক যোগ্যতা অর্জন।
* ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় ও তার হুকুম, রুকন ও শর্তাবলী, ধোঁকাবাজি, কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শর্তাবলী ইত্যাদি।
* সুদের সংজ্ঞা, সুদ গ্রহণের অপকারিতা, ব্যাংকিং কার্যক্রম ও তার ইসলামী পদ্ধতি, শুফ'আ ও তার পদ্ধতি, শিরকা, ইনান, আবদান, মুদারাবা, মুসাকা, মুবারেয়া, ইজারা, যায়লা, হাওয়ালা, দিমান, কিতাবাহ, কাফালাহ, রেহন, ওকালা, ছুলহু, করয, ওয়াকফ, হেবা ও তার পদ্ধতি, শর্তাবলী, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, দাম্পত্য জীবন, বিয়ে, তালাক, হুকুম ও এ সংক্রান্ত মাসয়ালাসমূহ। খোলা তালাক, হিলা, জিহার, লি'আন, নফকাত, রেহেম, দুধপান করানো, বাচ্চা প্রতিপালন সংক্রান্ত দায়িত্ব ও পদ্ধতি ইত্যাদি।
* ওয়ারিশ সংক্রান্ত হুকুমসমূহ ও তার পদ্ধতিসমূহ।
* কসম, নযর, কাফ্‌ফারাহ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও শর্তাবলী।
* জবাই করা, শিকার করা, খাদ্য গ্রহণ করা সংক্রান্ত নিয়মাবলী।
* পানীয় গ্রহণ, মদ, হুইস্কি জাতীয় বুদ্ধি হরণকারী যাবতীয় হারাম পানীয় পান করার শাস্তি সংক্রান্ত বিধান।
* বিচার ব্যবস্থা ও তার হুকুমসমূহ, কিছাছ, দিয়াত, ফৌজদারী দণ্ডবিধি ও তার বিস্তারিত শর্তাবলী, অপরাধের শাস্তি, যেনা-ব্যভিচার ও তার শাস্তি, অরাজকতা সৃষ্টিকারী, সন্ত্রাসী ও অপহরণকারীদের শাস্তি ও তার শর্তাবলী ইত্যাদি।
* যাদুকর, যিনদীক, মুরতাদ ইত্যাদির শাস্তি ও শর্তাবলী।

* কাজী নিযুক্তির শর্তাবলী, সাক্ষ্য গ্রহণ ও বিচার ব্যবস্থার হুকুমসমূহ।
* ক্রীতদাস মুক্তকরণ, শর্তাবলী ও হুকুমসমূহ।
* ইসলাম ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ব্যবস্থা।
* ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীপরিষদ, নির্বাচন পদ্ধতি, আইন ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামী শিল্পনীতি ইত্যাদি বিষয়াবলীর বিস্তারিত বিধি-বিধান ও মাসয়ালাসমূহ আহকামুশ্ শরী'আর অন্তর্ভুক্ত।

تاريخ علم الفقه ইসলামী আইন শাস্ত্রের ইতিহাস

প্রাথমিক অবস্থা ঃ মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় মুসলিম সমাজে কোন সমস্যা দেখা দিলে রাসূল (সা) নিজেই সেগুলো সমাধান করতেন। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর সমসাময়িক সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য আল-কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। আর সেসকল সমস্যার সমাধান করতে গিয়েই ফিকাহ শাস্ত্রের উৎপত্তি হয় এবং তখন থেকেই এর ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। ফিকাহ শাস্ত্রের প্রাথমিক উৎস ছিল আল কুরআন ও সুন্নাতুর রাসূল (সা)।

মহান ছাহাবীগণের যুগ

১. হযরত আবু বাক্‌র (রা)-এর যুগ ঃ ইসলামী শরী'আর বিধান সংক্রান্ত নতুন পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয় জানার জন্য প্রথম খলিফা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"হযরত আবু বাক্‌র (রা)-এর শাসন আমলে কোন নতুন সমস্যা উপস্থিত হলে তিনি পবিত্র কুরআন খুলে দেখতেন, তাতে উক্ত সমস্যার সমাধান পেলে তার ভিত্তিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতেন। যদি পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে কোন সমাধান না পেতেন তাহলে তিনি রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ মুতাবিক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মীমাংসা করতেন। যদি সুন্নাতেও উল্লেখিত বিষয়ে কোন কিছু না পেতেন তাহলে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের নিকট গিয়ে বলতেন, অমুক অমুক বিষয় আমার নিকট পেশ করা হয়েছে, আপনাদের কারো এ বিষয়ে রাসূল (সা)-এর কোন সমাধানের কথা জানা আছে কি? ঐ বিষয়ে যদি কেউ তাঁকে সহযোগিতা করতে পারতেন তখন আবু বাক্‌র (রা) বলতেন ঃ "আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আমাদের মধ্যকার কোন কোন ব্যক্তিকে রাসূল (সা)-এর

নিকট থেকে তাঁর শ্রুত বিষয় স্মরণ রাখার তাওফীক দিয়েছেন।"[৩৯] যদি তিনি সুন্নাহতে এ বিষয়ে কোন সমাধান না পেতেন তাহলে নেতৃস্থানীয় প্রথম শ্রেণীর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছলে তার ভিত্তিতে তিনি রায় প্রদান করতেন।[৪০]

এ সময় হযরত আবু বাক্‌র (রা) "কালালাহ"[৪১] এর মিরাস কী হবে, যাকাত অস্বীকারকারী ও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেয়া হবে, প্রাথমিক পর্যায়ে যারা হিজরাত করেছেন রাষ্ট্রীয় বাইতুলমাল থেকে তাদের ভাতা অন্যদের তুলনায় বেশি দেয়া যাবে কিনা, অধিক পরিমাণে হাফিযে কুরআন শহীদ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের হিফাযাতের জন্য তা একত্রে 'মাছহাফ' আকারে সংকলন করা হবে কিনা, সমকামিতার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার শাস্তি কী হবে এবং তাঁর পরে দ্বিতীয় খলিফা কে হবেন, তাঁর মনোনয়ন পদ্ধতি কী হবে ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তিগত বিচক্ষণতার সাহায্যে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মূল ইবারাত এর ব্যাখ্যা করে অথবা কেবল নিজ ইজতিহাদের ভিত্তিতে অথবা সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শ করে সমাধান করেছেন।[৪২]

২. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর যুগ ঃ দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রা) ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই সার্বক্ষণিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্যে থেকে পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী শরী'আতের হুকুম আহকাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মূল স্পিরিট মন-মগজে আত্মস্থ করেছিলেন। খিলাফাত পরিচালনাকালে ফায়সালা গ্রহণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে তিনি ছাহাবীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ করতেন, প্রয়োজনে বিতর্ক সভাও করতেন। শরীয়াতের বিভিন্ন আইনগত প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা ছিল একজন বিচক্ষণ ও সাবধানী রসায়নবিদের মতো, যিনি এমন ঔষধ প্রস্তুত করার চেষ্টা করতেন যা রোগীর উপর কোনরূপ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই

---

৩৯. মুহাম্মদ নূরুল আমিন জাওহার (অনুবাদক), ইসলামী উছূলে ফিক্‌হ (বি.আই.আই.টি) ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৭-৩৯
৪০. ইবনু কায়্যিম, ইলমুল মুওয়াক্কিঈন, খঃ ১, পৃ. ৫১
৪১. "কালালাহ" যার পিতা-মাতা বা সন্তান সন্ততি (পূর্ব পুরুষ বা উত্তর পুরুষ) কোন দিক থেকে সরাসরি কোন উত্তরাধিকারী নেই ।
৪২. মুহাম্মদ নূরুল আমিন জাওহার (অনুবাদক), ইসলামী উছূলে ফিক্‌হ, (বি.আই.আই.টি. ঢাকা, ২০০৩) পৃ. ২৭-৩০

রোগ নিরাময় করবে। ফলে হযরত উমার (রা) মানব জাতির জন্য ইসলামী শরী'আতী আইনের এক বিশাল সম্পদ রেখে যেতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে ইবরাহীম আন্-নাখঈ (র) বলেছেন, উমার (রা) শহীদ হওয়ার সাথে সাথে ইলম-এর দশভাগের নয় ভাগ দুনিয়া থেকে তিরোহিত হয়ে গেছে।[৪৩]

হযরত উমার (রা)-এর ইজতিহাদের অনুশীলনের প্রতি নজর দিলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। ভুল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাবধানতা হিসেবে অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে এবং আইনের আওতায় সহজতর ও সবচাইতে বেশি উপযোগী পন্থা হিসেবে জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে তিনি সকল সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। হযরত উমার (রা) পূর্বের দেয়া তাঁর কিছু কিছু সিদ্ধান্ত বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন। কারণ এগুলোর কোন কোনটি যে কারণে জারি করা হয়েছিল সে কারণ তখন আর বর্তমান ছিলনা এবং যে অবস্থার প্রেক্ষিতে সেগুলো জারি করা হয়েছিল সে অবস্থাও তখন আর অব্যাহত ছিল না। এরূপ কয়েকটি সিদ্ধান্ত হলো ঃ

(ক) বদর যুদ্ধের বন্দীদের হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি তাঁর অনুরোধের সিদ্ধান্ত।

(খ) হিযাবের ব্যাপারে তাঁর পরামর্শের সিদ্ধান্ত।

(গ) যে কেউ لا اله الا الله محمد رسول الله বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, একথা যেন রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের কাছে না বলেন, কেননা তাহলে লোকেরা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে আর কোন 'আমল করবে না– এ সিদ্ধান্ত।

(ঘ) হযরত আবু বাক্র (রা)-কে পরামর্শ প্রদান করা যে, তিনি যেন যারা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে বাইতুলমাল থেকে কোন অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান না করেন– এ সিদ্ধান্ত।

(ঙ) বিজিত দেশ সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে না দেয়ার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত ইত্যাদি।

৩. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর যুগ ঃ হযরত উমার (রা) এর শাহাদাতের পর হযরত উসমান (রা)-কে এই শর্তে খলিফা নির্বাচন করা

---

৪৩. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮

হয়েছিল যে, তিনি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের (সা) সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী দু'জন খলিফা কর্তৃক অনুসৃত নীতি অনুসারে কাজ করবেন। তিনি এই সকল শর্ত মেনে চলার অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু হযরত আলী (রা) বলেছিলেন যে, তিনি খলিফা নির্বাচিত হলে আল্লাহর কিতাব, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ অনুসারে এবং যথাসাধ্য তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ অনুসারে কাজ করবেন। হযরত উসমান (রা) পূর্ববর্তী দু'জন খলিফা কর্তৃক অনুসৃত নীতি অনুসারে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) তাঁর নিজস্ব অতিরিক্ত ভোট (Casting Vote) হযরত উসমানের (রা) অনুকূলে প্রদান করেন এবং হযরত উসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হন।[৪৪] এভাবে পূর্ববর্তী দু'জন খলিফা কর্তৃক অনুসৃত নীতি আইনের তৃতীয় উৎস হিসেবে তৃতীয় খলিফার যুগেই প্রবর্তিত এবং অনুমোদিত হয়।

হজ্জের সময় হযরত উসমান (রা) নিজেও ইজতিহাদ করেছিলেন। মিনায় ছালাত সংক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তিনি তা করেননি। এর সম্ভাব্য কারণ হয়ত তিনি মক্কায় বিয়ে করার কারণে ধরে নিয়েছিলেন যে মক্কার লোকদের জন্য মীনায় ছালাত সংক্ষিপ্ত করার অনুমতি নেই, অথবা বেদুঈনের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির আশংকা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি তা করেননি। এছাড়াও সবচাইতে উত্তম পদ্ধতি মনে করে যায়িদ বিন সাবিত এর পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার ফরমান জারি করেছিলেন।

৪. হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-এর যুগ ঃ হযরত উমার (রা)-এর মতই হযরত আলী (রা)ও একই পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআনের বাণীকে উপলব্ধি করতেন এবং তা সমাজে প্রয়োগ করতেন। গভীর চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে সাধারণ নীতিমালার আলোকে কোন বিশেষ ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতেন। খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের একজন শ্রেষ্ঠ বিচারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হযরত আলী (রা) কে ইয়ামানের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দান কালে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর নিকট এই বলে দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! তার জিহ্বাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং তার অন্তরকে (সঠিক দিকে) পরিচালিত কর।" বাস্তবেও আলী (রা) নিজেকে একজন সফল বিচারক হিসেবে প্রমাণ করেন এবং বহু কঠিন সমস্যার সমাধান করেন। নিজ জ্ঞানের

---

৪৪. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতি, তারিখুল খুলাফা মাতবায়া আসসা'দাহ, মিসর ১৯৫২, পৃ. ১৫৪-১৬০, দ্রষ্টব্য।

উপর নির্ভরশীলতার কারণে হযরত আলী (রা) বলেন, "আল্লাহর কসম! আল কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যা কী বিষয়ে, কোথায় এবং কেন নাযিল হয়েছিল তা আমি জানতাম না, আমার আল্লাহ আমাকে বোধশক্তি সম্পন্ন অন্ত করণ দিয়েছেন এবং দিয়েছেন সুস্পষ্ট জবান।"[৪৫]

হযরত আলী (রা)-এর নিকট কোন বিষয়ের বিচারের জন্য উপস্থিত হলে তিনি কোনরূপ ইতস্তত না করে তার ফায়সালা করতেন এবং তাঁর নিকট কোন বিষয়ের সমাধান চাওয়া হলে তিনি আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সা)-এর সুন্নাত থেকে উদ্ধৃতিসহ সমাধান দিতেন। বস্তুত কুরআন এবং সুন্নাহ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার কথা সর্বজনবিদিত। হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে আলী (রা) অন্য সকলের অপেক্ষা বেশি জ্ঞানী ছিলেন।

হযরত আলী (রা) সাধারণত তাঁর নিজের মতামত দিতে গিয়ে القِيَاسُ। (তুলনামূলক অনুমান) الاِسْتِصْحَابُ। (সংশ্লিষ্টদের পরিস্থিতি বিবেচনা করা) الاِسْتِحْسَانُ। (কিয়াসকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা) এবং الاِسْتِصْلَاحُ। (ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা) এর ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতেন। একবার এক মদ পানকারীর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর তার শাস্তি যথাসম্ভব বাড়িয়ে দেয়ার পরামর্শ আসে। তিনি القَذْفُ। (মিথ্যা অপবাদ) এর উপর ভিত্তি করে মদ্যপায়ীর শাস্তি ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় খলিফার শাসনামলে যৌথভাবে হত্যা পরিকল্পনার সাথে জড়িত একদল লোককে কিরূপ শাস্তি দেয়া যায় সে ব্যাপারে হযরত উমার (রা) হযরত আলী (রা)-এর মতামত চাইলেন। হযরত আলী (রা) বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন! যদি একদল লোক চুরি করার জন্য একত্রিত হয় তবে আপনি তাদের প্রত্যেকের একটি করে হাত কেটে দেবেন না?" হযরত উমার (রা.) হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে হযরত আলী (রা) বললেন, তবে এক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমার (রা) তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন:

"যদি সান'আর সকল নাগরিক একত্রে একজন লোককে হত্যা করে তবে আমি এই অপরাধে তাদের সকলকে হত্যা করতাম।" এখানে হত্যা এবং রাহাজানির মধ্যে কিয়াস করা হয়েছে, কারণ উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের সকলের

---

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

অপরাধ সংঘটনের মোটিভ একই। এ কারণে ভর্ৎসনা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এছাড়া হযরত আলী (রা) মুরতাদ ও ধর্মদ্রোহীদের যারা তাঁর উপর দেবত্ব আরোপ করেছিল তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এটি একটি অমার্জনীয় ও মারাত্মক অপরাধ। সুতরাং তিনি এ কাজের জন্য কঠোরতম শাস্তি আরোপ করলেন যাতে লোকেরা এ ধরনের কাজের চিন্তা থেকে বিরত থাকে।

একবার হযরত উমার (রা) খবর পেলেন যে, এক স্ত্রীলোকের বাড়িতে– যার স্বামী সামরিক অভিযানে গমন করেছিলেন– অপরিচিত লোকদের আগমন ঘটে থাকে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দূত মারফত উক্ত মহিলাকে নিষেধ করবেন যাতে সে স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন অপরিচিত লোককে তার ঘরে আসতে না দেয়। যখন উক্ত স্ত্রীলোক শুনলো যে, খলিফা তার সাথে কথা বলতে চান, তখন সে খুব ভীত হয়ে পড়লো। সে ছিল গর্ভবতী, উমার (রা) এর সাথে সাক্ষাত করতে আসার পথে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। উমার (রা) উক্ত ঘটনায় খুবই বিব্রত বোধ করলেন এবং এ ব্যাপারে ছাহাবীগণের পরামর্শ চাইলেন। উসমান ইবন আফফান (রা) এবং আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) সহ কয়েকজন ছাহাবী তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, আপনি কোন ভুল করেননি। এরপর হযরত উমার (রা) হযরত আলী (রা)-এর মতামত জানতে চাইলেন। আলী (রা) বললেন, "এ লোকেরা যা বলেছে তা যদি তাদের সাধ্যানুসারে সর্বোত্তম মত হয়ে থাকে তবে যথেষ্ট নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে, আর যদি তারা আপনাকে খুশী করার জন্য বলে থাকে তবে তারা আপনাকে প্রতারিত করেছে। আমি আশা করি আল্লাহ্ আপনার এ গুনাহ মাফ করবেন, যেহেতু তিনি জানেন আপনার উদ্দেশ্য ছিল ভালো। কিন্তু আল্লাহর কসম! আপনি উক্ত গর্ভ স্খলনের জন্য ক্ষতিপূরণ দান করুন। উমার (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম, আপনি আমার সামনে অকপটে রায় পেশ করেছেন। আমি শপথ করছি, আপনি ক্ষতিপূরণের এ অর্থ লোকদের মাঝে বিতরণ না করা পর্যন্ত আসন গ্রহণ করবেন না।" এভাবেই মহান ছাহাবীগণের যুগে আরও কিছু ফকীহ ছাহাবী পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদের দ্বারা ইসলামী শর'ঈ বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী আইনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাবে'ঈদের যুগে ইসলামী আইন প্রণয়ন

ছাহাবা-ই-কিরামের যুগ হিজরী ১১০ সাল নাগাদ শেষ হওয়ার পর থেকে ইসলামী শরী'আতের হুকুম আহকাম নিয়ে ফিক্‌হ তথা আইন শাস্ত্রের চর্চাকারী ও আইন প্রণয়নকারী তাবে'ঈগণের যুগ শুরু হয়। ছাহাবীদের পরে প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ইসলামী আইন সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁরা ছিলেন অধিকাংশই ছাহাবীগণের সাথে বসবাসকারী 'মাওয়ালী' বা মুক্তদাস, যেমন– হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) এর মুক্তদাস হযরত নাফে' (র), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) এর মুক্তদাস হযরত ইকরামা (র), মক্কার ফকীহ হযরত আতা ইব্‌ন রাবাহ (র), ইয়ামানবাসীদের ফকীহ হযরত তাউস (র), ইয়ামামার ফকীহ ইয়াহইয়া ইব্‌ন কাছীর (র), কুফার ফকীহ হযরত ইবরাহীম আন্‌-নাখঈ (র), বসরার ফকীহ হযরত হাসান আলবসরী (র) এবং হযরত মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র), খুরাসানের হযরত 'আতা আল-খুরাসানী (র) এবং আরও অনেকে। অবশ্য মদীনায় কুরাইশ বংশীয় ফকীহ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) ছিলেন এক্ষেত্রে অধিক প্রসিদ্ধ। মহান ছাহাবী (রা)-দের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত এ সকল তাবে'ঈগণের ইজতিহাদ প্রায় একই পদ্ধতি ও ধারায় পরিচালিত হয়েছিল। তাঁরা এ বিষয়ে যে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেছিলেন তাতে প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ পূর্বের তুলনায় আরও স্পষ্টতর রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে।

এ সময় হযরত হাসান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ আন্‌-নাখঈ (র) বলেন, আমি ইবরাহীম আন্‌-নাখঈ (র) কে বললাম ঃ আমি আপনাকে ইসলামী আইনের যেসকল সমাধান প্রদান করতে শুনি তা কি আপনি অন্য কাউকে দিতে শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ না, আমি বললাম ঃ যা আপনি শুনেননি তা আপনি সমাধান দিচ্ছেন কিভাবে? তিনি বললেন ঃ আমি যা শোনার তা তো শুনেছি, কিন্তু যখন আমি এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হই যা আমি আগে শুনিনি, তখন আমি যে বিষয়ে আগে শুনেছি সে বিষয়ের সাথে উদ্ভূত বিষয়টির তুলনা করি এবং কিয়াসের মাধ্যমে তার সমাধান পেশ করি, যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুরূপ হয়।[৪৬]

তাবে'ঈদের যুগে ইসলামী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আইনবিদদের মাঝে ব্যাপক মতপার্থক্য ঘটে। হযরত উমার বিন আবদুল আযীয (র) দু'টি পদক্ষেপের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করেন ঃ (১) তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকল

৪৬. ইবন হাজার, আল-ইসাবাহ, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১১২

হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন, (২) ইসলামী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কেবলমাত্র যোগ্যতর তাবে'ঈদেরকে নিয়োজিত করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসসমূহ চয়ন করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আতের হুকুম আহকাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ছাহাবীদের মতো তাবে'ঈরাও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয হযরত আবু বাক্‌র মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাজম আল-আনসারীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার কারণ বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস, সুন্নাহ বা আমল যা কিছু হোক খুঁজে দেখ ও তা আমার জন্য লিখে রাখ, কারণ আমার ভয় হয় আলিমগণ দুনিয়া থেকে চলে গেলে এ সকল ইলমও দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে।"[৪৭]

মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে ইসলামী আইন প্রণয়ন

এ যুগ সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) বলেছেন ঃ "এ যুগের ফকীহগণ রাসূলুল্লাহর (সা)-এর হাদীস, ইসলামের প্রথম যুগের বিচারকগণের রায়, ছাহাবী, তাবেঈ ও তৃতীয় প্রজন্মের আইন বিষয়ক পাণ্ডিত্য ইত্যাদি সবকিছুকে তাঁদের বিবেচনায় আনেন। অতঃপর তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ইজতিহাদ করেন। এভাবেই তৎকালীন আইনবিদগণ গবেষণা করেছেন। মূলতঃ তারা সকলেই ইজতিহাদের ক্ষেত্রে 'মুসনাদ'[৪৮] এবং 'মুরসাল'[৪৯] এ উভয় প্রকার হাদীস গ্রহণ করেন।

অধিকন্তু তাঁরা ছাহাবী ও তাবে'ঈগণের মতামতকে প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় দুই বা ততোধিক হাদীসের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হলে মুজতাহিদগণ দুটি হাদীসের মধ্যে কোনটি সঠিক সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ছাহাবীগণের মতামত অনুসন্ধান করতেন। এ ক্ষেত্রে যদি এ রায় পাওয়া যেত যে, একটি হাদীস রহিত করা হয়েছে অথবা শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না কিংবা কোন একটি হাদীস সম্পর্কে কিছু না

---

৪৭. আল-যারকানীর টীকা, ১ম খণ্ড পৃ. ১০

৪৮. মুসনাদ ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনাকারীদের পরম্পরা) অব্যাহতভাবে রাসূল (সা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

৪৯. মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা) কোন এক পর্যায়ে এসে ব্যাহত হয়েছে।

বলে নীরব থেকেছেন এবং উক্ত হাদীস অনুসারে আমল করেননি, তবে ধরে নেয়া হয়েছে যে, হাদীসটি কোন না কোনভাবে ত্রুটিপূর্ণ অথবা ত্রুটির কারণে কার্যকারিতা রহিত করা হয়েছে বা এর ব্যাখ্যা শাব্দিক অর্থে করা যাবে না। এভাবেই মুজতাহিদ ইমামগণ ছাহাবীগণের মতামত অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতেন। কোন বিষয়ে ছাহাবী এবং তাবে'ঈদের স্পষ্ট বক্তব্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হলে ফকীহ নিজের এলাকার ছাহাবী বা তাবে'ঈদের এবং নিজ শিক্ষকের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতেন।"[৫০]

পরবর্তী যুগের আইন বিশেষজ্ঞগণ যদি কোন সমস্যার ব্যাপারে তাদের পূর্ববর্তী ফকীহদের লেখা থেকে কোন সমাধান না পেতেন তাহলে তাঁরা তাদের নিজস্ব আইন বিষয়ক মতামত প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ফিরে যেতেন পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সংশ্লিষ্ট মূল উৎসে। এ যুগের গবেষকগণ তাদের গবেষণার বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত হন। সুতরাং মদীনায় ইমাম মালিক (র), মক্কায় ইবনু আবুযেব (মৃঃ ১৫৮ হিঃ), ইবনু জুরাইজ (মৃঃ ১৫০ হিঃ) এবং ইবনু উয়াইনাহ (মৃঃ ১৯৬ হিঃ), কুফার আছছাওরী (মৃঃ ১৬১ হিঃ) এবং বসরার রাবী' ইব্‌ন শুরাইহ্ (মৃঃ ১৬০ হিঃ) তাঁদের গবেষণার বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করে রাখেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা সকলে একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন।

ইসলামী আইনের মৌল গবেষক গোষ্ঠির (School of thought) মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন যারা ঃ

ছাহাবীদের মধ্য থেকে ঃ হযরত উমার (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা), আয়িশা (রা), ইবনুল আব্বাস (রা) ও যায়িদ বিন সাবিত (রা)।

তাবে'ঈদের মধ্য থেকে ঃ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (মৃঃ ৯৩ হিঃ), উরওয়াহ ইব্‌ন যুবায়ের (মৃঃ ৯৪ হিঃ), সালিম (মৃঃ ১০৬ হিঃ), আতা ইব্‌ন ইয়াসার (মৃঃ ১০৩ হিঃ), কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (মৃঃ ১০৩ হিঃ), উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (মৃঃ ৯৯ হিঃ), যুহরী (মৃঃ ১২০ হিঃ), ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (মৃঃ ১৪৩), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (মৃঃ ১৩৬ হিঃ) এবং রাবীয়াহ আর-রাঈ (মৃঃ ১৩৬ হিঃ)। এদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শরী'আতের আইনশাস্ত্র ও বিধান মদীনাবাসীদের

---

৫০. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা (মিসর), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০

কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য ছিল। এর কারণ ছিল ইমাম মালিক (র) উপরোক্ত সাহাবী ও তাবেঈগণের ইজতিহাদ ও শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তাঁর আইন বিষয়ক বিধি-বিধান উপস্থাপন করেছেন।

অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং তাঁর অনুসারীগণের আইন বিষয়ক মতামত, হযরত আলী (রা), শুরাইহ (মৃঃ ৭৭ হিঃ) এবং আশ-শা'বী (র) (মৃঃ ১০৪ হিঃ) এর প্রদত্ত রায়সমূহ এবং ইবরাহীম আন্ নাখঈ (মৃঃ ৯৬ হিঃ) এর সমাধানসমূহ কুফাবাসীর নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য ছিল। ইমাম আবু হানিফা (র) মূলতঃ ইবরাহীম আন্ নাখঈ (র) ও তাঁর সহকর্মীগণ প্রদত্ত আইন বিষয়ক ব্যাখ্যার ভিত্তি রেখে গেছেন।[৫১]

মুজতাহিদ ও ইমামগণের পক্ষ থেকে ইসলামী শরী'আর আইন কানুন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের পর্যাপ্ত কার্যক্রম হিজরী ২য় শতাব্দীর প্রথম হতে চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চালু ছিল। এ যুগেই ব্যাপক তামাদ্দুনিক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। খলিফা আবু জা'ফর আল-মানসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এ যুগে ইসলামী আইনশাস্ত্র "ইল্‌মুল ফিক্‌হ" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের রূপ লাভ করে। এসময়ই বিভিন্ন মুজতাহিদ ও ইমামদের গবেষণালব্ধ আলাদা আলাদা মাযহাব-এর উৎপত্তি ঘটে। প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের স্থপতি ছিলেন ইমাম আযম আবু হানিফা (র), ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও ইমাম মালিক (র)।

আব্বাসীয় যুগে মুজতাহিদ ও ইমামদের মধ্য থেকে ইসলামী আইন রচনার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানের লক্ষ্যে বিতর্কমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের মাযহাব ভিত্তিক বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়। এরপর থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের মাযহাব ভিত্তিক তাকলিদের যুগের সূচনা হয়।

শরী'আত নির্দেশিত দিক নির্দেশনায় পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্যের কারণে ইসলামে প্রধানত চারটি মাযহাবের উৎপত্তি হয়। নিম্নে এই চার মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

১। **হানাফী মাযহাব :** মাযহাবসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ মাযহাব হলো হানাফী মাযহাব। পৃথিবীর অধিক সংখ্যক মুসলমান এ মাযহাবের অনুসারী। এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানিফা (র)। তিনি ৭০০ সালে কুফায়

---

৫১. ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী; উছুলুল ফিক্‌হ আল-ইসলামী, অনুবাদ : মুহাম্মদ নূরুল আমিন জাওহার, বি.আই.আই.টি. ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৩-৪৮

জন্মগ্রহণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কুরআন ও হাদীসের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন উৎসের উপর গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার ফল ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিরাট গ্রন্থ 'ফিকহুল আকবর'।

ইমাম আবু হানিফা (র) তাঁর গবেষণা কাজে প্রধানত আল কুরআনকে একমাত্র অবলম্বন হিসেবে অনুসরণ করেছেন। হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার উপর পূর্ণ সন্তুষ্ট না হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী পণ্ডিত। অযৌক্তিক কোন কিছুকেই তিনি গ্রহণ করতেন না। তিনি আল কুরআনের আলোকে যুক্তির সাহায্যে যে কোন প্রশ্নের মীমাংসায় পৌছার চেষ্টা করতেন। তিনিই সর্বপ্রথম আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইজমা ও কিয়াসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইসলামী সমাজের প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও আচার-ব্যবহারকে তিনি আইন প্রণয়নের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন বিধায় তাঁকে এবং তাঁর সহচরদেরকে 'আহলুর-রায়' বা 'যুক্তিবাদী' বলা হত। তিনি বাগদাদে সমাহিত হয়েছেন।

২। **মালিকী মাযহাব :** মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইমাম মালিক (র)। তিনি ৭১৩ সালে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি কুরআন ও হাদীসের উপর গবেষণা করে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। ইসলামী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি কুরআন ও হাদীসকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। যুক্তিকে তিনি তেমন কোন প্রাধান্য দেননি। তিনি বহুসংখ্যক হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। 'কিতাবুল মুয়াত্তা' নামে তিনি একটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর নামানুসারে এই মাযহাবের নামকরণ হয় মালিকী মাযহাব।

৩। **শাফে'ঈ মাযহাব :** শাফে'ঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইমাম শাফে'ঈ (র)। তিনি ৭৬৭ সালে ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ইমাম মালিকের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং হানাফী মাযহাব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি 'কিতাবুল উম্ম' নামক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি হাদীসকেই মূলভিত্তি হিসেবে অবলম্বন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শাফে'ঈ মাযহাব হানাফী ও মালিকী মাযহাবের মাঝামাঝি পন্থা। হানাফী ও মালিকী মাযহাবের সাথে তার পার্থক্য হলো হানাফী মাযহাব শুধুমাত্র কুরআনকেই প্রাধান্য দিয়েছে। আর মালিকী মাযহাব শুধু মদীনার প্রচলিত হাদীসকেই গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু ইমাম শাফে'ঈ সকল হাদীসের উপরই

সমানভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মদীনার হোক বা অন্যান্য দেশের রাবীর বর্ণনাই হোক সকল হাদীসকেই তিনি গ্রহণ করেছেন।

৪। **হাম্বলী মাযহাব** : হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল। তিনি ৭৮০ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে ইমাম শাফে'ঈর একজন ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। তিনি বহু মুসলিম দেশ ভ্রমণ করে হাদীসের উপর গবেষণা করেন এবং ইসলামী আইন শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'মুস্‌নাদ-ই-আহমাদ' নামক গ্রন্থ। তাঁর মাযহাবের ভিত্তি প্রধানত হাদীস। তিনি কোন প্রকারের যুক্তিতর্ক পছন্দ করতেন না। তাঁর মতবাদ তদানীন্তন মুসলিম সমাজকে শিরক ও বিদ'আত থেকে রক্ষা করেছিল। তাঁর মতবাদ যুক্তিবাদী মু'তাজিলাদের মতবাদের তীব্র বিরোধী ছিল। এ কারণে তাঁর মাযহাবকে ইসলামের মূলনীতির দুর্গ বলা হয়।[৫২]

ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিধিবদ্ধকরণ تدوين القوانين الشرعية دستورا

হিজরী ৪০ সন পর্যন্ত মহানবী (সা) ও চার খলিফার যুগে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে ইসলামী আইন ব্যবস্থার মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়। হিজরী (৪১-১৩২) উমাইয়্যা ও (১৩২-৬৫৫) আব্বাসীয় যুগে ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানিক গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী আইন-বিধানের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। মহানবী (সা)-এর যুগ হতে পরবর্তী দেড়শত বছর ধরে সরাসরি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে। উক্ত দুই উৎসে সরাসরি কোন পথ নির্দেশ না পাওয়া গেলে খুলাফা-ই রাশিদীনের সিদ্ধান্তসমূহ অনুসরণ করা হত। এ ক্ষেত্রেও কোন নির্দেশনা সহজলভ্য না হলে বিচারক স্বীয় ইজতিহাদের মাধ্যমে মুকাদ্দামার ফায়সালা করতেন। কিন্তু ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিধিবদ্ধ আকারে কোন মডেল না থাকায় ক্রমান্বয়ে মতানৈক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এ ধরনের মতভেদ দূর করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ইবনুল মুকাফ্‌ফা (মৃ: ১৪৪ হিঃ) আব্বাসী খলিফা আবু জাফর আল মানসুর (মৃ: ১৫৮হিঃ)-কে পত্র মারফত গোটা দেশের জন্য শর'ঈ আইনের একটি বিধিবদ্ধ সংকলন প্রণয়নের প্রস্তাব দেন ও তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। খলিফা এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও কিছু বাস্তব কারণে এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

---

৫২. শেখ মুহাম্মাদ আল-খুদরী বেক, তারীখ আত্‌তাশরী' আল-ইসলামী, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, বৈরুত, ১৯৮৮, পৃ. ১৫২-১৭৪

হিজরী দ্বিতীয় শতকে ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর সাথীবৃন্দ ইসলামী আইনে যথারীতি গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁদের অক্লান্ত গবেষণা কার্যক্রমের দ্বারা তাঁরা কেবল তাঁদের সময়কার উদ্ভূত সমস্যার আইনগত সমাধান পেশ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং সুদূর ভবিষ্যতেও কী ধরনের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে সমাধান-ই বা কী হতে পারে তাও তাঁরা স্থির করে তার আইনগত সমাধান নির্ণয় করেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর সাথীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইসলামী আইনের একটি ব্যাপক কাঠামো প্রণীত হয় এবং পরবর্তী কালের হানাফী ফকীহগণ তাকে আরও সম্প্রসারিত করেন। হিজরী ১১শ সনে মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর সিংহাসনে আরোহণের চার বছর পর একটি রাজকীয় ফরমানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রণয়নের নির্দেশ জারি করেন। এ কাজ সফলতার সাথে সমাধার জন্য তৎকালীন প্রখ্যাত ভারতীয় ফকীহগণের সমন্বয়ে এবং স্বনামধন্য আলিম নিযাম উদ্দিন বুরহানপুরীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি দীর্ঘ আট বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইসলামী আইনের একটি সুবৃহৎ সংকলন প্রণয়ন করেন, যার নামকরণ করা হয় "ফাতওয়া-ই আলমগিরী।" সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত এটিই ইসলামী আইন শাস্ত্রের সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ সংকলন। আইন শাস্ত্রের পাশ্চাত্য বিন্যাস অনুসরণ করে ইসলামী আইনকে ধারা, উপধারা ও ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী সাজানোর জন্য তুর্কী উসমানী সরকার ১৮৬৯ সালে সাদাত পাশার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি ১৮৫১টি ধারা সম্বলিত ইসলামী দেওয়ানী আইনের একটি সংকলন প্রণয়ন করে, যা 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যা' নামে পরিচিত। এই সংকলনটি প্রধানত ফাতওয়া-ই আলমগিরীকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে রচিত হয়েছে। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্যে এটি বলবৎ থাকে। এরপর আর কোন সরকারই ইসলামী আইনকে আধুনিক পদ্ধতিতে বিন্যাসের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অবশ্য পাকিস্তানে ইসলামী রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর অধীনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ড. তানযীলুর রহমান ধারাবাহিকভাবে ইসলামী আইনের আধুনিক বিন্যাস সমাপ্ত করেছেন "মাজমুয়াহ কাওয়ানীনে ইসলামী" নামে। আমাদের দেশেও সম্প্রতি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী বোর্ডের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ

কিছু ইসলামী আইনের সংকলন রচনার কাজ সমাপ্ত করেছে।[৫৩] এ কাজটি পূর্ণাঙ্গভাবে সমাপ্ত করা প্রয়োজন।

উপসংহার

পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লব ও যন্ত্রশক্তির আবিষ্কারের সাথে সাথে যখন সমাজ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে তখনই পাশ্চাত্যের খৃস্টান জাতিগুলো দুর্দমনীয় শক্তি ও জাগতিক যোগ্যতা নিয়ে বিজয়ীর বেশে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এককালের দুর্দমনীয় মুসলিম শক্তি খৃস্টশক্তির উত্থানের আনুপাতিক হারে পতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। সেসময় খৃস্টান জাতি প্রায় গোটা মুসলিম জাহানে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। নিত্য নতুন আবিষ্কার ও গবেষণার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শক্তি ধর্মবিবর্জিত এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে। ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা, ব্যাংক, বীমা ও অনুরূপ আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে তোলে। নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারী প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং এগুলোর শাখা প্রশাখা কল্পনাতীতভাবে বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের রচিত আইনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য রচিত আইনের বহু ক্ষেত্রেই বিরোধ রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রীয় সভ্যতার পতনের সাথে সাথে মুসলিমদের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও আইনের গবেষণায়ও চরম স্থবিরতা নেমে আসে। যান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে প্রতিযোগিতা করে অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে আধুনিক কালের একটি ইসলামী সরকার ব্যবস্থা পরিচালনার মত ইসলামী আইন কাঠামো গড়ে তোলা বিভিন্ন কারণে মুসলিম ফকীহগণের পক্ষে সম্ভব হয়নি। একইভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ব্যবসা, বাণিজ্য, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্যও কোন সুষ্ঠু ইসলামী আইন কাঠামো গড়ে তোলাও সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্প্রসারণের ফলে মুসলিম ফকীহগণের আইনের গবেষণা ব্যক্তিগত ইবাদাত বন্দেগী, বিবাহ-তালাক ইত্যাদির মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। তবে আশার বিষয় এই যে, সম্প্রতি ব্যাংক,

---

৫৩. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৯৫, ভূমিকা।

বীমা ও এ জাতীয় আর্থিক ও বাণিজ্যিক কিছু প্রতিষ্ঠান ইসলামী আইনের কাঠামোতে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের চেষ্টা শুরু হয়েছে।

একটি আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্র ও এর অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইসলামী আদর্শের বিধান অনুযায়ী সুসংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে বিধিবদ্ধভাবে ইসলামী আইনশাস্ত্র পূর্ণাঙ্গভাবে প্রণয়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখা অতীব জরুরী কাজ। যদিও বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। খৃস্টান জাতির উত্থানের সময় থেকে প্রায় আড়াইশত বছরের ইসলামী আইন প্রণয়নের গবেষণার ফাঁক অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ করা যদিও সহজ নয় তবুও মহান আল্লাহর দেয়া অফুরন্ত সম্পদ কাজে লাগিয়ে উপযুক্ত জ্ঞানী ইসলামী গবেষকদের দ্বারা বিষয় ভিত্তিক আলাদা বোর্ড গঠন করে পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা চালালে একাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব নয়। বিগত শতাব্দীতে মহান আল্লাহ মুসলিম জাহানকে সর্বত্রই স্বাধীনতা দিয়েছেন ও অফুরন্ত সম্পদ দিয়েছেন। এ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে হারানো পূর্ণ ইসলামী সভ্যতা পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা ছাড়া মহান আল্লাহর দেয়া উক্ত নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের বিকল্প পথ নেই। আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিবর্গকে এ কাজে এগিয়ে আসার তাওফিক দিন।

[প্রবন্ধটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের গবেষণা বিভাগের ১৭ই মে, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ স্টাডি সেশনে পঠিত হয়। মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে প্রবন্ধটির মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন–

ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, মাওলানা খলিলুর রহমান আলমাদানী, মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান, মাওলানা রাফিকুর রহমান, ড. মানজুরে ইলাহী, মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউছুফ খান, মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল্লাহ, হাফেজ আকরাম ফারুক, মাওলানা আবদুল হাকীম আলমাদানী প্রমুখ।]